গঙ্গারিডি ঃ আলোচনা ও পর্যালোচনা

শ্রীনরোত্তম হালদার

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০৭৩

গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র
কাকদ্বীপ, দক্ষিণ২৪পরগণা—৭৪৩৩৪৭

প্রথম প্রকাশ : খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮৮ / বঙ্গাব্দ ১৩৯৫

সর্বস্বত্ব : গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকা

প্রচ্ছদ : কমল চৌধুরী

গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকার পক্ষে সম্পাদক শ্রীনরোত্তম হালদার কর্তৃক কাকদ্বীপ, দক্ষিণ-২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ—৭৪৩৩৪৭ থেকে প্রকাশিত এবং ফাল্গুনী প্রেস, ডায়মণ্ডহারবার হতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকা প্রচারে
যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা
আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে—

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সর্বজনশ্রদ্ধেয়
মহান শিক্ষাব্রতী
কবি বিভুপ্রসাদ বসু
এবং
মুর্শিদাবাদের প্রবীণ সমাজসেবী
ও সংস্কৃতি-গবেষক
ডাঃ রাধানাথ সরকার

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

MAP OF GANGARIDAE

Part of India 'Intra Gangem' (Within the Ganges)

Map from the Latin edition of Ptolemy's Geography printed at Rome in 1490.

সূচীপত্র

মানচিত্র ও চিত্রসূচী

মানচিত্র

আলোকচিত্র

ভূমিকা

ম্যাকিডন অধিপতি গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার তাঁর দিগ্বিজয় অভিযান-কালে ৩২৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে যখন পাঞ্জাবে এসে উপনীত হন, তখন পাঞ্জাব বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তিনি পাঞ্জাবের রাষ্ট্রগুলিকে পরাহত করে যখন ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা করছিলেন তখন তিনি সংবাদ পান যে ভারতের অভ্যন্তরস্থ দুই পরাক্রমশালী রাষ্ট্র যথা প্রাসিওই ও গঙ্গারিডি যৌথভাবে তাদের বিপুল সৈন্যবাহিনী ও বিশাল রণসম্ভার নিয়ে তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য অপেক্ষা করছে। পাঞ্জাব পর্যন্ত এসেই আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা প্রাসিওই ও গঙ্গারিডি রাষ্ট্রদ্বয়ের অধিবাসীদের শৌর্যবীর্য ও পরাক্রমের কথা শুনে, ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। অগত্যা আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর পশ্চিম তীর হতেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালের গ্রীক ও রোমান লেখকগণ গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের লোকদের শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন। কিন্তু গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের সঠিক অবস্থান ও তার সীমানা আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। গ্রীক ও রোমান সূত্র থেকে আমরা মাত্র এইটুকু জানতে পারি যে গঙ্গারিডি রাষ্ট্র গঙ্গানদীর মোহানা দেশে অবস্থিত ছিল এবং এই রাষ্ট্রের প্রধান বন্দরের নাম ছিল 'গাঙ্গে'।

ভারতীয় সাহিত্যে কিন্তু গঙ্গারিডি নামে কোন রাষ্ট্রের উল্লেখ নেই। তবে এই নেতিবাচক প্রমাণ থেকে আমরা কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না। তার কারণ, ভারতীয় সাহিত্যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ নেই। তা বলে কি আমরা সিদ্ধান্ত করব যে আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব আক্রমণ করেন নি?

গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের প্রচুর উল্লেখ এবং ভারতীয় সাহিত্যে তার অনুল্লেখ হেতু গঙ্গারিডি রাষ্ট্র আমাদের কাছে এক প্রহেলিকা হয়ে রয়েছে। তবে গঙ্গারিডি নামে যে এক পরাক্রমশালী রাষ্ট্র নিম্নবাঙলায় ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে তার অনুল্লেখ হেতু গঙ্গারিডি রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনদিন আমরা মাথা ঘামাই নি। গঙ্গারিডি রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'বাঙলার কলঙ্ক' প্রবন্ধে। তারপর গঙ্গারিডি রাষ্ট্র সম্বন্ধে লেখেন রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর 'গৌড় রাজমালা' গ্রন্থে। আরও পরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় তাঁর 'আলেকজাণ্ডার কেন বিপাশা নদী অতিক্রম করেন নি?' শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধে।

গঙ্গারিডি নামে নিম্নবাঙলায় যে এক রাষ্ট্র ছিল এবং সেই রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যে এক অতি পরাক্রমশালী জাতি ছিল, সে সিদ্ধান্ত আজ সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু তার সঠিক অবস্থান ও সীমানা নির্ধারণ, আমাদের বরাবরই বিব্রত করে এসেছে। সেজন্য এ সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য কাকদ্বীপের শ্রীযুক্ত নরোত্তম হালদার একক প্রচেষ্টায় এক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন, এবং ওই গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে গঙ্গারিডি সম্বন্ধে নিরলসভাবে অনুশীলন ও অনুসন্ধান করে আসছেন। ওই গবেষণাকেন্দ্র থেকে প্রকাশিত এক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে তিনি গঙ্গারিডি সম্বন্ধে নিজের ও নানাজনের অনুশীলনের ফল প্রকাশ করছেন। সেই সব লেখার মাধ্যমে গঙ্গারিডিকে তার তিমিরাবৃত গর্ভ থেকে আলোকের মুক্তাঙ্গনে এনে উপস্থিত করা সম্ভবপর হয়েছে। বাঙলাদেশের বিস্মৃত ইতিহাসকে উদ্ধার করাই তিনি তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত করে নিয়েছেন। তাঁর মত একজন সম্বলহীন সনিষ্ঠ গবেষক আমি খুব কম দেখেছি। ইতিপূর্বে নরোত্তমবাবু গঙ্গারিডি সম্বন্ধে একখানা বই লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর বর্তমান গ্রন্থখানিতে তিনি গঙ্গারিডির অবস্থান ও আয়তন এবং তার আর্থসামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে এই বিষয়ে নূতন আলোকপাত করেছেন। তিনি গ্রীক ও রোমান সূত্রসমূহ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে এই আলোচনা ও পর্যালোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যে সকল গ্রীক ও রোমান লেখক গঙ্গারিডির উল্লেখ করে গেছেন এবং যাঁদের গ্রন্থ থেকে নরোত্তমবাবু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের নাম আমি নীচে সংক্ষিপ্ত টীকাসমেত উল্লেখ করছি–

(১) মেগাস্থিনিস (৩৫০—২৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)—মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তমৌর্য যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক নৃপতি প্রথম সেলুকাস নিকেটরকে পরাজিত করেন, তখন সন্ধিমূলে তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রে মেগাস্থিনিস নামে এক গ্রীকদূত আসেন (৩০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তিনি এ দেশে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান, বিভিন্ন জাতি, রাজ্য, নদনদী, পর্বতমালা, প্রাণী ও উদ্ভিদকুল সম্বন্ধে Indica নামে এক গ্রন্থ লেখেন। সম্পূর্ণ Indica গ্রন্থ পাওয়া যায়নি, কিন্তু তার অংশবিশেষ পরবর্তী লেখকগণের উদ্ধৃতির মধ্যে রয়ে গিয়েছে।

(২) পুবলিয়াস্ ভার্জিলিয়াস্ মারো (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৭০—১৯)। Virgil বা Vergil নামে পরিচিত। তিনি রোমদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী ছিলেন। চারখণ্ডে রচিত 'জর্জিকাস্' তাঁর অন্যতম কাব্য খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৩৬ থেকে ২৯-এর মধ্যে রচিত। তাঁর গ্রন্থে গঙ্গারিডিদের শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে প্রশস্তিমূলক উক্তি আছে।

(৩) ডিওডোরাস সিকুলাস—খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক। 'বিবলিওথিকা হিস্‌টরিকা' নামে ৪০ খণ্ডে সম্পূর্ণ তিনি এক বিশ্বের ইতিহাস লেখেন।

(৪) গেইয়াস প্লিনিয়াস্ সেকাণ্ডাস (২৩—৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)। রোমদেশীয় মনীষী; ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত 'হিস্‌টরিয়া ন্যাচারালো' নামে এক বিশ্বকোষ রচনা করে গেছেন। ইনি Pliny নামে সুপ্রসিদ্ধ।

(৫) পেরিপ্লাস অভ্ দি ইরিথ্রিয়ান্ সী (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)। মিশর দেশীয় একজন অজ্ঞাতনামা নাবিক, নাবিকদের সুবিধার জন্য গ্রীক ভাষায় এই পথনির্দেশ সংবলিত গ্রন্থ লেখেন। মনে হয় লিখিত বিষয় সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল, কেননা, এই গ্রন্থে লেখক খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যেমন মিনান্দারের (খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০—১৩৫) মুদ্রাসমূহ দাক্ষিণাত্যে নর্মদা বিধৌত অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। ইনি 'গাঙ্গে' নামক নগর-বন্দরের উল্লেখ করে গেছেন।

(৬) ভেলেরিয়াস ফ্লাক্‌কাস (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)। রোমদেশীয় কবি। 'আরগনটিকা' (Argonautica) নামে 'গোলডেন ফ্লীস' ('হিরণ্ময় মেষের লোম')-এর সন্ধানে লিখিত কাব্যে তিনি গঙ্গারিডি দেশের বীরদের প্রশংসা করেছেন।

(৭) কার্টিয়াস্ রিউফাস্ (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)। রোমদেশীয় ঐতিহাসিক 'ডি ভারবাস্ গেস্টো আলেকজাণ্ড্রি ম্যাগনি' নামক আলেকজাণ্ডারের জীবনী লিখে গেছেন।

(৮) ক্লডিয়াস্ টোলেমিয়াস (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী)। টলেমি নামে সুপ্রসিদ্ধ। আলেকজাণ্ড্রিয়ার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। ভূগোল বিষয়ক এক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর গ্রন্থেও 'গাঙ্গে' নামক বন্দর-নগরের উল্লেখ আছে।

(৯) গেইয়াস জুলিয়াস্ সলিনাস্ (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক)। ব্যাকরণ-বিদ ও লেখক। সমসাময়িক জগতের এক বৃত্তান্ত লিখে গেছেন, নাম 'পলিহিস্‌টর'।

উপরের এই তালিকা থেকে দেখা যাবে যে যাঁরা গঙ্গারিডি সম্বন্ধে উল্লেখ করে গেছেন, তাঁদের সময়কাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যেই ভারতে রচিত হয়েছিল মহাভারত ও জাতকগ্রন্থ। কিন্তু এই দুই গ্রন্থের কোনটাতেই গঙ্গারিডি বা গাঙ্গে নামক কোন বন্দর-নগরের নাম নেই। যে বন্দর-নগরের নাম আছে তা হচ্ছে তাম্রলিপ্তি। মহাভারত ও জাতকগ্রন্থসমূহে গঙ্গারিডি ও গাঙ্গে নগরের অনুল্লেখে কিছু এসে যায় না। কেননা এ

সম্বন্ধে সেই একই কথা বলতে চাই। নেতিবাচক প্রমাণ থেকে কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। যারা প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত তারা যখন এ সম্বন্ধে উল্লেখ করে গেছেন, তখন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কোন কারণ নেই। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের সহিত বাংলাদেশের যে সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, তা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় বণিকরা যে বাংলার অভ্যন্তরস্থ বন্দরসমূহে বাণিজ্য উপলক্ষে উপস্থিত হতেন, তা পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত ক্রীটদেশীয় প্রত্নদ্রব্যসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি। কালানুক্রমিকভাবে এ বাণিজ্য অনেককাল আগে থেকেই চলে এসেছিল এবং পরেও চলেছিল। এ বাণিজ্য যে পরেও চলেছিল তা আমরা জানতে পারি চব্বিশপরগণার চন্দ্রকেতুগড়, আটঘরা, হরিহরপুর, মল্লিকপুর, হরিনারায়ণপুর ও মেদিনীপুর জেলার টিলডা, পান্না, কাঁথি ও তমলুকে উৎখননের ফলে যে সব প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গেছে তা থেকে। এ সব প্রত্নদ্রব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীস্টজন্মের এদিক-ওদিক শতাব্দীতে নিম্নবাঙলার সঙ্গে গ্রীক ও রোমান-জগতের খুব সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য চলত। এ সব অঞ্চল থেকে আমরা যে সব প্রত্নদ্রব্য ও পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলকসমূহ পেয়েছি তাতে চিত্রিত মানুষের বেশভূষা, পাদুকা, কেশবিন্যাস প্রভৃতির রীতিসমূহ যে অভ্রান্তরূপে গ্রীক ও রোমান শিল্পশৈলীর প্রভাব বহন করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (অতুল সুর 'হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল'—১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮ দ্রঃ)। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আসবার পূর্বে 'ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতিরা তাম্র আহরণের জন্য বাঙলাদেশে এসে হাজির হয়েছিল।' (অতুল সুর, 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন,' পৃষ্ঠা ৬০)। এটা স্বতসিদ্ধ সত্য যে যখন দুই সুদূর দেশের মধ্যে বাণিজ্যের লেনদেন চলে, তখন তারা পরস্পর উভয়দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। 'অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে যে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশ ছিল, তা আমরা অন্য সূত্র থেকেও জানতে পারি। ভেলেরিয়াস্ ফ্লাক্কাস্ তাঁর 'আরগনটিকা' পুস্তকে লিখে গেছেন যে গঙ্গারিডি দেশের বাঙালী বীরেরা কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ১৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরই প্রতিধ্বনি আমরা ভার্জিল-এর 'জর্জিকাস্' নামক কাব্যেও দেখি। ভার্জিল ওই কাব্যে লিখেছেন যে গঙ্গারিডির বীরবৃন্দের শৌর্যবীর্যের কথা তিনি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবেন।' (অতুল সুর 'হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অভ বেঙ্গল'-১৯৬৩ ও 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস'-১৯৭৬ দ্রঃ)। তারও পূর্বে বাঙলাদেশের সঙ্গে সিন্ধু-

সভ্যতার বাহকদের ও সুমেরীয়দের সম্পর্ক ছিল। (অতুল সুর, 'সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান' দ্রঃ)। এ সব তথ্য থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় সাহিত্যে তার অনুল্লেখ থাকলেও গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অমূলক ব্যাপার নয়।

যে সব লেখক ও গ্রন্থের নাম আমি উপরে করেছি এবং যার ভিত্তিতে নরোত্তমবাবু গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অবস্থান ও তার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থখানি রচনা করেছেন, সেখানা যে অনন্যসাধারণ বই সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

সবশেষে আমি নৃতত্ত্বের কথা কিছু বলতে চাই। নরোত্তম বাবু গঙ্গারিডির অধিবাসীদের বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পূর্বপুরুষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ ধারণা যে একেবারে অমূলক নয়, তা আমার 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' (প্রথম প্রকাশ-১৯৪২, জিজ্ঞাসা-সংস্করণ ১৯৭৭, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৭৯, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৬) গ্রন্থে আমি পশ্চিমবঙ্গের জাতিসমূহের আদিনিবাস সম্বন্ধে যে ছক্ প্রদান করেছি, তার দ্বারা সমর্থিত। যেহেতু গত একশ বছরের মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুবিধা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বাঙলার জনগণ তাদের আদিনিবাস থেকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে, সেই কারণে আমি বর্তমান কালের পরিসংখ্যানের পরিবর্তে একশ বছর আগের পরিস্থিতির সাহায্য নিয়েছি। সেই বিবেচনায় আমি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারিতে প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই ছকটি তৈরী করেছি। ছকটি আমি নীচে দিচ্ছি—

স্থান	মে	হু	ব	বাঁ	বী	২৪	ন
প্রথম	১	১	৫	৯	২	১২	১
দ্বিতীয়	২	৫	২	৩	৫	১	৬
তৃতীয়	৩	৩	৩	৭	৩	৩	৩
চতুর্থ	৪	৬	৬	৬	৮	৫	১১
পঞ্চম	৫	২	৭	১১	৯	৬	১০

টীকা—জেলা : মে = মেদিনীপুর ; হু = হুগলি-হাওড়া ; ব = বর্ধমান ; বাঁ = বাঁকুড়া ; বী = বীরভূম ; ২৪ = চব্বিশপরগণা ; ন = নদীয়া।

জাতি : ১ = কৈবর্ত্ত ; ২ = সদ্‌গোপ ; ৩ = ব্রাহ্মণ ; ৪ = তাঁতী ; ৫ = বাগদি ; ৬ = গোয়ালা ; ৭ = তিলি ; ৮ = ডোম ; ৯ = বাউরী ; ১০ = চণ্ডাল (নমঃশূদ্র) ; ১১ = চামার ; ১২ = পোদ (পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়)।

এই ছকটি থেকে দেখা যাবে যে চব্বিশ পরগণার 'পোদ' (আদম স্থমারীতে এই নামটিই ব্যবহৃত হয়েছিল) জাতিরই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে আধিপত্য ও প্রথম স্থান ছিল। অপরপক্ষে ভাগীরথীর পশ্চিমভাগে মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্তদের স্থান ছিল প্রথম। (অতুল সুর 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,' পৃষ্ঠা ৪৭—৫২ দেখুন)।

নরোত্তম বাবু নৃতত্ত্ববিদ নন্। কিন্তু নানা সূত্র থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা যে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের তথ্য দ্বারা সমর্থিত, সেই সংজ্ঞাই পরিয়ে দিয়েছে তাঁর মাথায় গবেষণা ও অনুসন্ধানের জয়মুকুট।

৩ বি, নেবুবাগান বাই-লেন — **অতুল সুর**
বাগবাজার, কলকাতা-৩ — ২৩ মার্চ, ১৯৮৮

অবতরণিকা

গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকায় ১৯৮৭ সালের জুন-সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি এই পুস্তকে পুনঃ-প্রকাশিত হল। সে হিসাবে এই পুস্তকখানি 'গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকা গ্রন্থমালা'র প্রথম গ্রন্থ। গঙ্গারিডিরা এদেশে কি নামে পরিচিত ছিল, তারা কোন্ নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাদের রাজধানী ও রাজ্যের প্রকৃত অবস্থানক্ষেত্র প্রভৃতি বিতর্কিত বিষয়গুলি আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এই পুস্তকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা গেছে যে, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনরাজ্যের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ 'দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধন' একদা বিদেশীগণ কর্তৃক গঙ্গারিডি রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। সমগ্র গাঙ্গোপদ্বীপ অর্থাৎ উপবঙ্গ ছিল সেই গঙ্গারিডিদের অধিকারে। তাদের রাজধানী ছিল গঙ্গানগর; সেখান থেকে তাদের দলপতি রাজ্যশাসন করতেন। গঙ্গানগর ছিল সমুদ্রোপকূলের একটি গাঙ্গেয় বন্দর। এই বন্দর-সন্নিহিত অঞ্চলে গঙ্গা-জনপদ ছিল গঙ্গারিডিদের মূল বাসভূমি। একথা ঠিক যে, গঙ্গা জনপদ ও গঙ্গারিডি রাজ্যের পত্তন করেছিল এখানকার অদিবাসিন্দারা। তারা ছিল বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ, এ কথাও অনস্বীকার্য। বিবর্তিত অবস্থায় তাদের বংশধররা বিপুল সংখ্যায় ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ হিসাবেও পরিগণিত। ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বৈষম্যের প্রতিক্রিয়ায় এরা ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এভাবে এরা বৈষ্ণবদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে।

অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্রাচীন-ক্ষত্রিয়পন্থী পুণ্ড্রজাতি হীনবল হয়ে পড়েছিল এবং বিদেশী আক্রমণে পিছু

হঠতে হঠতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকূলের অরণ্যসংকুল প্রদেশে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল রচনা করেছিল। দ্রাবিড়দের মত পৌণ্ড্ররাও প্রাচীন ভারতের একটি প্রসিদ্ধ জাতি। ভারতীয় প্রাচীনগ্রন্থাদিতে পৌণ্ড্রদের সঙ্গে ওড্র, দ্রাবিড়, দরদ, কিরাত, খস, মাহিষক প্রভৃতি 'প্রাচীন-ক্ষত্রিয়ধর্মী' জাতিসমূহের নাম পাপাপাশি উল্লিখিত হয়েছে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত সিন্ধুসভ্যতা ছিল দ্রাবিড়সভ্যতা, আর নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত গঙ্গারিডি বা গাঙ্গেয়-সভ্যতা ছিল প্রাচীন পৌণ্ড্রসভ্যতা। একদা দক্ষিণভারতে ও পূর্বভারতে পুণ্ড্রগণের আধিপত্য ছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র চব্বিশপরগণা জেলায় ও বাংলাদেশের খুলনা জেলায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলার পূর্বদক্ষিণাংশে এদের সংখ্যা কম নয়। এদেরই পূর্বপুরুষদের নেতৃত্বে নমঃশূদ্র, রাজবংশী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, মাহিষ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, নাপিত, সদ্গোপ, হৈহয়ক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, কর্মারক্ষত্রিয়, দলুইক্ষত্রিয় প্রভৃতি যোদ্ধৃ-জাতিসমূহের পূর্বপুরুষদের সমন্বয়ে পুণ্ড্রবর্ধনরাজ্যে যে দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং যে শৌর্য-সম্পদ-শালী জাতির (Nation) উত্থান হয়েছিল, প্রাচীনভারতীয় গ্রন্থে তারা 'পৌণ্ড্র' বা 'পুণ্ড্রবর্ধনীয়' নামে অভিহিত। বিদেশী গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ প্রাচীন পুণ্ড্রজাতিকে 'গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠী' (tribe) আখ্যা দিয়েছেন এবং উক্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে 'গঙ্গারিডি জাতি' (Nation) নামে অভিহিত করেছেন। পুণ্ড্রজাতির রক্তধারা কেবলমাত্র বাঙালী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দেহে প্রবাহিত নয়, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের ন্যায় প্রাচীন পুণ্ড্রদেরও রক্তধারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সংমিশ্রিত হয়েছে এবং বাণিজ্য ও যুদ্ধ উপলক্ষে প্রবাসী গাঙ্গেয়-পৌণ্ড্ররা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হ'য়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর 'সোস্যাল পলিটি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সঙ্গে উড়িয়া, মালব ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ঔদীচ্য চিৎপাবন, দেশস্থ ব্রাহ্মণ, মারাঠা, যুরুবা এবং কানাড়া ও তেলেগু ব্রাহ্মণদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ব্যাপক নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন; বাঙালী পৌণ্ড্রদের সঙ্গে রাজপুতদের যেমন সাদৃশ্য আছে, তাদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদেরও তেমন সাদৃশ্য আছে বলে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন। বাঙ্গালার সব্যসাচী গবেষক ডঃ অতুল সুর মহাশয়ের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে, নৃতাত্ত্বিক

index) ৭৭·৮, আর মুসলমানদের ৭৭·৯ কৈবর্তদের ৭৭·৫, গোয়ালাদের ৭৭·৩, নমঃশূদ্রদের ৭৮·১, কায়স্থদের ৭৮·৪, সদ্‌গোপদের ৭৮·৬, ব্রাহ্মণদের ৭৮·৮, এছাড়া পলীয়দের ৭৬·৮, ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের ৭৬·৪, সাঁওতালদের ৭৬·১, মালপাহাড়িয়াদের ৭৫·৮, রাজবংশীদের ও ওরাঁওদের ৭৫·৪, বাউরীদের ৭৫·১. মুণ্ডাদের ৭৪·৫। কিন্তু পরিসীমা অনুযায়ী এদের শিরসূচক-সংখ্যা—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ৭০-৮৫, ব্রাহ্মণ ৭২-৮৭, সদ্‌গোপ ৭২-৮৭, কৈবর্ত ৭০-৮৭, ওরাঁও ৬৭-৮৭, সাঁওতাল ৬৯-৮৮, কায়স্থ ৭০-৮৮, নমঃশূদ্র ৭০-৮৯। অর্থাৎ উর্ধতম বিস্তৃত শিরস্কের শিরাকার-জ্ঞাপক পরিসীমার সূচক-সংখ্যা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ৮৫; ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত ও ওরাঁওদের ৮৭, সাঁওতাল ও কায়স্থদের ৮৮, নমঃশূদ্রদের ৮৯। এবং অনুরূপভাবে, নিম্নতম দীর্ঘশিরস্ক ব্যক্তিদের শিরাকার-জ্ঞাপক পরিসীমার সূচক-সংখ্যা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত ও কায়স্থদের ৭০, বাউরীদের ৭১, সদ্‌গোপ ও ব্রাহ্মণদের ৭২। নাসিকাকার সূচক-সংখ্যা (nasal index) ও দেহ-দৈর্ঘ বিষয়েও অনুরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সব নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সাদৃশ্য প্রাচীন পৌণ্ড্রদের সঙ্গে অন্যান্য জাতিসমূহের পরস্পর রক্ত-মিশ্রণের পরিচয় প্রদান করে। এভাবে, প্রাচীন গঙ্গারিডি জাতির (Nation) রক্তধারার সঙ্গে বর্তমান বাঙালী মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রক্তধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা অনস্বীকার্য।

মহাপরাক্রমশালী জাতি হিসাবে গঙ্গারিডিদের আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি ছিল; আর বর্তমান শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়গুলির পূর্বপুরুষরাই ছিল সেই বিশ্বজোড়া সুখ্যাতির অধিকারী। অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-পুণ্ড্র-বঙ্গদের রক্তধারা এসব সম্প্রদায়ের মানুষের ধমনীতে প্রবাহিত। বৈদিক-আর্যদের বিশুদ্ধ রক্তধারা কোন বাঙালীদেহেই নাই। বর্তমান বাঙলার প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের দেহে এই মিশ্র রক্তধারা প্রবাহিত। গঙ্গারিডিরা এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি; তাদের বংশধররা বিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বর্তমানে এদেশে যারা কৃষিজীবী-শ্রমজীবী সম্প্রদায়রূপে পরিচিত, তাদের পূর্ব-পুরুষরাই ছিল সেই বিখ্যাত গঙ্গারিডি জাতি; সুতরাং গঙ্গারিডির ইতিহাস কোন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ইতিহাসমাত্র নয়; এই ইতিহাস গঙ্গার অববাহিকায় আপামর জনসাধারণের গৌরবময় ইতিহাস। তাদের ঐতিহ্য এবং আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত ভারত-ইতিহাসে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়।

যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যগ্রহণে এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হল, তাঁদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। —বিনীত গ্রন্থকার

গঙ্গারিডি ও প্রাসী নামের উৎস

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে (সেপ্টেম্বর, ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকে তাঁর অনুগামী লেখকগণ এবং গ্রীক, মিশরীয় ও রোমান ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণ এই পূর্বভারতে গঙ্গারিডি ও প্রাসী নামে দুটি পরাক্রমশালী স্বতন্ত্র জাতির উল্লেখ করেছেন। গঙ্গারিডি (Gangaridae) শব্দের অর্থ গাঙ্গেয়গণ অর্থাৎ গাঙ্গেয় জনগোষ্ঠী (Tribe of the Gangaridae) বা 'গাঙ্গেয় জাতি' (Nation of the Gangaridae), তাঁদের রাজা এবং দেশ (রাষ্ট্র) অর্থেও এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে; এর উৎস ইন্দোএরিয়ান ভাষা। গঙ্গারিডি শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আগে ছিল নানা মুনির নানা মত। গঙ্গারাঢ়ী (গঙ্গানদী অথবা গঙ্গবংশ ও রাঢ়ী জাতি), গঙ্গাহৃদয় বা গঙ্গাহৃদি, গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারাষ্ট্রী, গৌড় প্রভৃতি শব্দ গঙ্গারিডির উৎস হিসাবে কল্পিত হয়েছিল; কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে, এই শব্দগুলির কোনটাই সে হিসাবে ঠিক নয়। ভাষাতাত্ত্বিকগণ এ সম্পর্কে এখন একটি ইতিহাস-বিজ্ঞানসম্মত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, আচার্য সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীগণ একান্ত অধ্যবসায়ে গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা অনুশীলন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন।

গ্রীক-ব্যাকরণ অনুসারে 'গঙ্গারিদ্' (গাঙ্গেয়) শব্দের একবচনে গঙ্গারিদেস্ এবং বহুবচনে গঙ্গারিদই (গাঙ্গেয়গণ); সে হিসাবে মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক লেখকগণ প্রথমে গঙ্গারিদেস (Gangarides) ও গঙ্গারিদই (Gangaridai) এ দুটি শব্দই ব্যবহার করেছিলেন। পরে রোমানরা জাতিবাচক 'গঙ্গারিদই' শব্দটিকে ল্যাটিন বানানে গঙ্গারিডি (Gangaridae) রূপে ব্যবহার করেন। অতঃপর দেশবাচক শব্দ হিসাবেও 'গঙ্গারিডি' ও 'গঙ্গারিদই' এ দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোন কোন গ্রীক লেখক (যেমন, ডিওডোরাস) আবার ওই একই অর্থে 'গন্দারিদই' (Gandaridai) শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার কারণ, গ্রীকদের নিকট অধিক পরিচিত জাতিবাচক ও দেশবাচক 'গন্ধার' (গান্ধার) শব্দটির প্রভাবে ভুল পাঠোদ্ধারের ফলে গঙ্গারিদই স্থলে গন্দারিদই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছিল; একই কারণে গন্দারিতই (Gandaritai) শব্দের প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে (যেমন, প্লুটার্কের রচনায়) দেখা যায়।

'গঙ্গারিডি' শব্দের উৎস বিষয়ক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত তথ্য সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন আচার্য সুনীতিকুমার। তাঁর এই বাস্তব সিদ্ধান্ত একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত; কিন্তু ''গন্দারিদই শব্দ সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন" বলে ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ ১৯১২ সালে প্রকাশিত 'গৌড় রাজমালা' গ্রন্থে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তার সমাধান মিলল দীর্ঘ ৭১ বৎসর পরে; ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত 'গঙ্গা-রিডি : ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ' গ্রন্থে "ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সাম্প্রতিক অভিমত" গঙ্গারিডি-গবেষণার ইতিহাসে নূতন তথ্য হিসাবে একটি মূল্যবান সংযোজন। তাঁর শেষজীবনে রচিত 'গঙ্গারিদৈ' নামক প্রবন্ধটি এই গবেষণা-গ্রন্থে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রীক-ব্যাকরণ-সম্মত ঐ একই অভিমত এবং তথ্য-প্রমাণসহ গন্ধার শব্দের প্রভাব সম্পর্কে তিনি এখানে বিশদ আলোচনা করেছেন ('গঙ্গারিডি : ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ'—শ্রীনরোত্তম হালদার 'সংযোজন' (পৃষ্ঠ: ১৩৯।)

দেশীয় 'গঙ্গার' শব্দের সঙ্গে গ্রীক-বিভক্তি 'ইদ্'—যোগে 'গঙ্গারিদ্' শব্দটি গ্রীকদের দ্বারা নির্মিত। তারপর ইদ্-বিভক্তির একবচন ইদেস্-যোগে 'গঙ্গারিদেস্' এবং বহুবচন 'ইদই'-যোগে 'গঙ্গারিদই' থেকে ল্যাটিন বানানে 'Gangaridae'; কিন্তু 'গঙ্গা' আমাদের নিকট অতিপরিচিত শব্দ হলেও, 'গঙ্গার' শব্দটি সুপরিচিত নয়। এই গঙ্গার-শব্দের উৎপত্তি 'গঙ্গাল' থেকে; পঞ্চাল, বঙ্গাল প্রভৃতি শব্দেরমত 'আল'-প্রত্যয়যোগে গঙ্গার সঙ্গে সম্বন্ধসূচক গঙ্গাল শব্দের সৃষ্টি, যার অর্থ 'গাঙ্গেয়-জনগোষ্ঠী; এভাবে বাংলার দাঁতাল, মাথাল, পাঁকাল, দুধাল প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। 'র' ও 'ল'-এর অভেদক্রমে পূর্বভারতের 'গঙ্গাল-শব্দ পশ্চিমভারতে পঞ্জাব অঞ্চলে 'গঙ্গার'-এ পরিবর্তিত হয়েছে। সেখান থেকে গ্রীকরা গঙ্গার শব্দটি গ্রহণ করে এবং গ্রীক-বিভক্তি ইদ্-যোগে গঙ্গারিদ্-শব্দ গঠন করে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুইস্টিক্স' (এমেনো সংবর্ধনাগ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৭০—৭৪) এবং ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে ('গঙ্গারিডি ও সুনীতিকুমার'—আনন্দবাজার পত্রিকা—১৯/১১/১৯৭৮ দ্রষ্টব্য) 'গঙ্গারিডি'র উৎস বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। আচার্য সুকুমার সেন আচার্য সুনীতি কুমারের এই গঙ্গাল শব্দের সমর্থনে লিখেছেন যে, 'বঙ্গাল' মানে 'বঙ্গপুষ্ট' অথাৎ প্রচুর কাপাস-পুষ্ট দেশ হলে 'গঙ্গাপুষ্ট' অর্থাৎ গঙ্গাপুষ্ট দেশ হতে বাধা নেই (বঙ্গভূমিকা-১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১২-পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

'প্রাসী' Prasii শব্দটির মূলেও ইন্দো-এরিয়ান ভাষা। এর বহু-বচনে 'প্রাসিওই' (Prasioi) অর্থাৎ 'প্রাচ্যগণ' বা মগধবাসিগণ; সুতরাং এটিও একটি জাতিবাচক শব্দ। দেশবাচক শব্দ হিসাবেও এর ব্যবহার পাওয়া যায়; এর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (Palibothra)। এই প্রাসী-শব্দের উৎস কিন্তু 'পরাশ' বা পলাশ (এখানেও 'র' ও 'ল'-এর অভেদক্রমে এই দুটি শব্দই প্রচলিত)। অত্যধিক পলাশ বা পরাশ গাছের জন্য পাটলিপুত্র তথা মগধ 'পরাশ' নামে অভিহিত। Palas—Paras—Pras—Prasii—Prasioi, Praxiakos = পরাশক অর্থাৎ পরাশীয় বা পরাশবাসী তথা পাটলিপুত্রবাসী বা মগধবাসী; সুতরাং প্রাসিওই-শব্দের প্রকৃত অর্থ 'মগধবাসিগণ', আর মগধ সাম্রাজ্য 'প্রাচ্য' দেশ হিসাবে পরিগণিত বলে এর বিশেষ অর্থ 'প্রাচ্যগণ'। গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রাসী ও গঙ্গারিডিদের যুক্ত-সাম্রাজ্যকে 'গঙ্গারিডি' (গাঙ্গেয়) নামে অভিহিত করায় গঙ্গারিডিদের গৌরব বর্ধিত হয়েছে। গঙ্গারিডির ন্যায় প্রাসী শব্দটিও তাঁরা নানাভাবে লিখেছেন: মেগাস্থিনিস—Praxiakos (?), ডিওডোরাস—Braisioi, প্লিনি—Prasii, কার্টিয়াস—Pharrasii, নিকোলাই দামাস্ক—Prausioi, জাস্টিন—Praesides, প্লুটার্ক ও এলিয়ান—Praisioi, স্ট্রাবো ও আরি-য়ান—Prasioi।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ অনেকেই সংস্কৃত 'প্রাচ্য' শব্দকে 'প্রাসী' শব্দের উৎস হিসাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রাচীনকালে আর্যাবর্তকে প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যম—এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল। উদীচ্য পশ্চিমভাগকে বলা হয়েছে, আর প্রাচ্য বলতে পূর্বভাগ—অর্থাৎ শুধু মগধ নয়, বঙ্গদেশও এর মধ্যে পড়ে। তথাপি এ অঞ্চলকে বাদ দিয়ে শুধু মগধকেই প্রাসী বলার কারণ কি? আমার এই কৌতূহলের নিরসন হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক রজনীকান্ত গুহের লেখায় উক্ত পলাশ বা পরাশ প্রসঙ্গ দেখে। মূল গ্রীকভাষা থেকে অনুবাদিত "মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ" নামক গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন (ডঃ বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত "মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ," পুনর্মুদ্রণ-১৩৯১, পৃষ্ঠা-২০৬ দ্রষ্টব্য)।

গঙ্গারিডি ও গঙ্গের অবস্থানক্ষেত্র

কুষাণযুগে টলেমি (২য় শতক) লিখেছেন যে, গঙ্গার মোহনাসমূহের সমীপবর্তী প্রদেশ গঙ্গারিডিগণের (Gangaridai) মূল বাসভূমি এবং রাজধানী 'গঙ্গা' (Gange) নগরে এদের রাজা বাস করেন। তিনি আরো

লিখেছেন যে, গঙ্গার মোহনা পাঁচটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরে পড়েছে। স্ব-অঙ্কিত 'ভারতবর্ষের আন্তর্গাঙ্গেয় অংশের' (Indicae intra Gangem Pars) নক্সায় তিনি গঙ্গার যে প্রাচীন গতিপথ দেখিয়েছেন, তার পশ্চিমতীরে 'তাম্রলিপ্ত' (Tamalites) বন্দর ; এই ধারাটি সর্বপশ্চিমে 'কংসাবতী' (Cambysum) মোহনায় সাগরে মিশেছে। গুপ্তযুগে কালিদাসও 'কপিশা' নামে এই কংসাবতীকেই দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম সীমারূপে উল্লেখ করেছেন। এটি হল টলেমি-বর্ণিত গঙ্গার পঞ্চমুখের প্রথম মুখ। তিনি পূর্বদিকে সর্বশেষ মুখটির নাম দিয়েছেন 'এ্যান্টিবোল' (Antibola) ; ভূগোল ও ইতিহাসবিদগণের মতে, এই ধারাটি হল পদ্মা-যমুনা-বুড়ীগঙ্গা-মেঘনার সম্মিলিত প্রাচীন ধারা। এই পাঁচটি মোহনার অন্তর্বর্তী নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকাসমূহে তিনি গাঙ্গেয়-জনপদের (GANGARIDAE) অবস্থান নির্ণয় করেছেন ; সুতরাং টলেমির মতে, এই বুড়ীগঙ্গাধারা অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত গঙ্গানদীর প্রাচীন ধারাটি গঙ্গারিডিদের পূর্ব সীমা। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে মেগাস্থিনিস এবং খ্রীঃ পূঃ ১ম শতকে ডিওডোরাসও লিখেছেন যে, এই গঙ্গা গাঙ্গেয়দিগের (Gandaridai) দেশের পূর্বসীমা। অতঃপর সলিনাস (৩য় শতক) লিখেছেন যে, গঙ্গার সর্বনিম্ন বিস্তার ৮ মাইল ও সর্বাধিক বিস্তার ২০ মাইল এবং গভীরতা ১০০ ফুটের কম নয় ; শেষপ্রান্তে যে জাতি বাস করে তার নাম গাঙ্গেয় (Gangarides)। তৎপূর্বে মেগাস্থিনিস ও প্লিনি (১ম শতক) লিখেছিলেন যে, গঙ্গার শেষাংশ গাঙ্গেয় (Gangarides)-গণের দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত ছিল।

১ম শতকের একজন মিশরবাসী গ্রীক-নাবিক তাঁর 'ইরিথ্রিযান-সমুদ্রের পথনির্দেশিকা' (পেরিপ্লাস মারিস ইরিথ্রিয়াই) নামক ভ্রমণবৃত্তান্তে এই গাঙ্গেয়দের জনপদকে 'গঙ্গে' (Gange) নামে অভিহিত করেছেন এবং গঙ্গাতীরে 'গঙ্গে' নামক একটি হাট-শহর (Market-town) বা বাণিজ্য-নগরীরও সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী পূর্বঘাট অতিক্রম করে, বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে 'দশারিণ' অর্থাৎ দশার্ণ বা উড়িষ্যার পর পূর্বমুখে ঘোরার সময় তিনি লিখেছেন যে, অতঃপর আবার যেতে হবে পূর্বদিকে ; ডাইনে মুক্ত-সমুদ্র এবং বামে উপকূল রেখে জাহাজ চালালে পড়বে 'গঙ্গে', এখানে বৃহত্তম গঙ্গানদী সাগরে পড়েছে, এর তীরে একটা হাট-শহর আছে তার নামটিও 'গঙ্গে'। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বিশেষ যুক্তি-তথ্য সহ এই 'গঙ্গে' বা গঙ্গানগরকে (City of Gange) প্রাচীন গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের তীর্থনগর হিসাবে প্রথম উল্লেখ করেন ১৯৪৭ সালে

বোম্বাইয়ে-অনুষ্ঠিত 'ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের' ১০ম অধিবেশনে ; সঠিক তথ্যাদি নির্ধারণে ইতিহাসের শক্ত-মানুষ দীনেশচন্দ্র সরকার সারাজীবন এই অভিমতই পোষণ করে গেছেন। সাংস্কৃতিক-ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের-সংস্কৃতি'তেও এই অভিমতের বলিষ্ঠ সমর্থন মেলে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে সেই স্থানটি এখনকার গঙ্গাসাগরের আরো অনেকটা দক্ষিণে উপসাগর-গর্ভে নিমজ্জিত।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাসে' লিখেছেন যে, গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ কেউ বলেছেন গঙ্গানদী গঙ্গারিডিদের পূর্বসীমা কেউ বলেছেন পশ্চিমসীমা, আর কেউ বলেছেন ঐ নদীর শেষাংশ গঙ্গারিডিদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিশেছে ; সুতরাং পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্বে পদ্মা-মেঘনার অন্তর্বর্তী স্থানে গঙ্গারিডিদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এক্ষেত্রে তিনি গ্রীক-ঐতিহাসিকদের বিবরণ পর্যালোচনা করে উপবঙ্গ বা গাঙ্গোপদ্বীপকেই গঙ্গারিডিদের রাজ্য বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। টলেমির নকসাতেও আমরা গঙ্গারিডি জনপদের পশ্চিম-সীমারূপে গঙ্গানদীর সরস্বতী-কংসাবতী ধারাটিকে দেখতে পাই। সুতরাং, একদিকে গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পশ্চিমসীমা, অপরদিকে পূর্বসীমা এবং এই নদীর শেষাংশ গঙ্গারিডির উপর দিয়ে প্রবাহিত—এ তিনটী মতই যথার্থ। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও যেভাবে টলেমির নক্শায় গঙ্গার পঞ্চমোহনার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তাতেও সমগ্র গাঙ্গোপদ্বীপই (Gangetic delta) গঙ্গারিডি রাজ্য হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়। এই গাঙ্গোপদ্বীপ বা উপবঙ্গ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, আগে পূর্ব ও পশ্চিমে তদপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ছিল। উত্তর থেকে পূর্ব সীমায় গঙ্গা যেমন পদ্মা-যমুনা-বুড়িগঙ্গা-মেঘনায় সাগরমুখ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পশ্চিম-সীমায় গঙ্গার অপর শাখাটিও তেমন বিহারের পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণসীমান্ত থেকে সুরু হয়ে রাজমহল-সাঁওতালপরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম দিয়ে নেমে এসে অজয়-দামোদর-রূপনারায়ণ-সরস্বতী-কংসাবতীকে সংযুক্ত করে বর্তমান হুগলীমোহনার পশ্চিমদিকে সাগরে পড়ত। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর রচনায় 'বাংলার নদনদী' পর্যায়ে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছেন।

অতএব শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে আমরা যে উপবঙ্গ' বা গাঙ্গোপদ্বীপের পরিচয় পাই, সেটাই প্রকৃতপক্ষে গঙ্গারিডিদের রাজ্য। নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় সেই প্রাকৃতিক রাজ্যসীমার মধ্যে পড়ে—বর্তমান মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে বিহারের পূর্বদিকের সামান্য কিছু অংশ, মুর্শিদাবাদ জেলা, বর্ধমান জেলার

পূর্বাংশ, হুগলী ও হাওড়া জেলা, মেদিনীপুর জেলার পূর্বদক্ষিণে হুগলীনদী-তীরবর্তী অঞ্চল, ২৪ পরগণা, কলকাতা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা ; সুতরাং উত্তরকালের সমগ্র দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি এবং অঙ্গ, কজঙ্গল, ঔদুম্বরিক, উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণ-রাঢ় ও বর্ধমান ভুক্তির পূর্বাংশ এবং বঙ্গ ও সমতটের পশ্চিমাংশ পূর্বকালে এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একদা কলিঙ্গের বিস্তৃতি ছিল বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত, সে হিসাবে মেগাস্থিনিস ও প্লিনির 'গাঙ্গেয় কলিঙ্গ' (Gangarides Calingae) এবং তার রাজধানী 'পর্তেলিস' (বর্ধমানের পূর্বস্থলী) ছিল সম্ভবতঃ গঙ্গার পূর্বতীরে, এই প্রাকৃতিক-সীমার মধ্যেই। আবার, গঙ্গারিডি বা গাঙ্গোপ-দ্বীপের পশ্চিমাংশ হিসাবে পুণ্ড্র এবং কলিঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল উত্তরকালে একদা রাঢ়ভূমি রূপে পরিগণিত হয়েছিল। কয়েকস্থানে বিদেশী লেখকগণ মগধ বা প্রাচ্য (প্রাসী), কলিঙ্গ (কলিঙ্গী), তাম্রলিপ্ত (তালুকেট) ও গাঙ্গেয় (গঙ্গারিডি) গণকে সামগ্রিকভাবে গাঙ্গেয়-জাতি এবং পাটলিপুত্রকে (Palibothra) প্রাচ্য-গঙ্গার যুক্তরাজধানী এবং সেখানকার রাজাকে অর্থাৎ মগধ-সম্রাটকে গাঙ্গেয়-যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিপতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু প্রাসি, গঙ্গারিডি, তাম্রলিপ্ত ও কলিঙ্গী এই চারটি রাজ্যের পৃথক পৃথক রাজধানী ও সেনাবাহিনী প্রভৃতির উল্লেখ থেকে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মেলে। সুতরাং, সংযুক্ত মিত্ররাজ্যরূপে এই চারটি রাজ্য একত্রে গঙ্গারিডি যুক্তরাষ্ট্র (কনফেডারেশন) হিসাবে নাম-ভূমিকায় 'গঙ্গারিডি' জনগোষ্ঠীর (Tribe of the Gangaridae) খ্যাতি-বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে।

গঙ্গারিডি, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, প্রাসী

প্লিনি তাঁর Historia Naturalis গ্রন্থে, হিমালয় (Emodus) পর্বত-সান্নিধ্যের একাংশে বসবাসকারী হিমবান (Imaus) জাতিগুলির মধ্যে মক্কোকলিঙ্গী (Moccoocalingae) এবং আরও ৫টি জাতির নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি লিখেছেন যে, গঙ্গা-তীরবাসী সমুদ্রের নিকটবর্তী জাতির নাম কলিঙ্গ (Calingae)। গাঙ্গেয় (Gangarides) দেশে গঙ্গার শেষাংশ। কলিঙ্গজাতির রাজধানী পর্তেলিস। ৬০,০০০ পদাতিক, ১,০০০ অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকে ও রাজাকে রক্ষা করে। গঙ্গায় একটি প্রকাণ্ড দ্বীপে যে একটি মাত্র জাতি থাকে, তার নাম মধ্যকলিঙ্গ (Modogalingae)। তারপর তিনি পঞ্চাল (Passalae), তাম্রলিপ্ত (Talucate) প্রভৃতি আরও ১২টি জাতির নাম উল্লেখ করে লিখেছেন যে, এই সকল জাতির রাজারা প্রত্যেকেই ৫০,০০০ পদাতিক,

৪,০০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ হস্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখেন। এদের পরেই তিনি অধিকতর পরাক্রান্ত অন্ধ্র (Andarae) জাতি এবং দরদ (Derdae) ও শাতক (Setae) গণের উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি লিখেছেন যে, এই প্রদেশে এবং প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে, প্রাচ্যগণই (Prasii) পরাক্রম ও প্রতিপত্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সুবিস্তৃত ও মহৈশ্বর্য্যশালী পাটলিপুত্র (Palibothra) তাদের রাজধানী, এজন্য কেউ কেউ এই জাতিকে এমন কি গঙ্গাতীরবর্তী সমস্ত ভূভাগকেই পাটলিপুত্র নামে অভিহিত করে থাকেন। এই জাতির রাজা বেতন দিয়ে সর্বদা ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ৯,০০০ হস্তী রাখেন. এ থেকে তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য অনুমিত হতে পারে। তিনি আর এক স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, গঙ্গার মোহনা থেকে কলিঙ্গ(Calingon) অন্তরীপ অর্থাৎ, বর্তমান গোদাবরী অন্তরীপ ৬২৫ রোমক মাইল। সলিনাস তাঁর ভূগোল-বিবরণে লিখেছেন যে, গঙ্গার শেষ প্রান্তে যে জাতি বাস করে, তার নাম গাঙ্গেয (Gangarides), এদের রাজার ১,০০০ অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী ও ৬০,০০০ পদাতিক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে। গঙ্গাতে একটি বহুজনাকীর্ণ দ্বীপ আছে, তাতে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে; তার রাজার ৫০,০০০ সশস্ত্র পদাতিক ও ৪০০ সশস্ত্র অশ্বারোহী আছে। বহু-বলধারী প্রাচ্যজাতি পাটলিপুত্র নগরে বাস করে, এজন্য কেউ কেউ এই জাতিকেও পাটলিপুত্র বলেন। এই জাতির রাজা বেতন দিয়ে সর্বদা ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ৮,০০০ হস্তী পোষণ করেন।

প্লিনি ও সলিনাসের এই বিবরণ আমরা পণ্ডিত প্রবর রজনীকান্ত গুহ অনূদিত 'মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ' থেকে জানতে পারি। তাঁরা উভয়েই মেগাস্থিনীসের 'Ta Indica' অর্থাৎ 'To India' নামক মূল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সহকারে এই বিবরণ প্রদান করেছিলেন। উভয় বর্ণিত বিবরণে সেনাবাহিনীর সাদৃশ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে—সলিনাস যাকে শুধু 'বহু জনাকীর্ণ ও প্রবলপরাক্রান্ত' বলেছেন, প্লিনি তাকেই মধ্যকলিঙ্গ বলেছেন এবং সলিনাস যাকে শুধু 'গঙ্গারিডি' জাতিরূপে উল্লেখ করেছেন প্লিনি তাদের সঙ্গে 'গঙ্গারিদেস-কলিঙ্গী' হিসাবে আরও একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন ও তার রাজধানী পর্তেলিসের নামোল্লেখ করেছেন। রজনীকান্ত ও ম্যাক্রিণ্ডলের অনুবাদের এই অংশে গঙ্গারিডি ও কলিঙ্গ পৃথক্-ভাবে উল্লিখিত হলেও, ম্যাক্রিণ্ডল তাঁর টীকায় লিখেছেন, "The common reading, however—'Gangaridum Calingarum,

Regia' &c, makes the Gangarides a branch of the Calingae. This is probably the correct reading" সুতরাং এক্ষেত্রে এই গঙ্গারিদেস ও কলিঙ্গী বলতে গঙ্গারিডি জাতির সঙ্গে কলিঙ্গীদের একাংশ বোঝাচ্ছে, যারা একদা গঙ্গারিডিদের প্রাকৃতিক রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠীর সমান সেনাবলও তাদের ছিল; কিন্তু আবার, ম্যাক্রিণ্ডল তাঁর রচিত প্রাচীন ভারতের একটি মানচিত্রে মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুসরণে, উপবঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের বিশাল অংশকে GANGARIDAI (গঙ্গারাষ্ট্র) হিসাবে দেখিয়েছেন, যার মধ্যে গঙ্গোপদ্বীপ, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত তথা সুহ্ম ও কলিঙ্গের সমগ্র অঞ্চল অবস্থিত। এই মানচিত্রে গঙ্গার উত্তরে MITHILA ও PASSALI এবং গঙ্গার দক্ষিণে MAGADH ও GANGARIDAI-কে সমতুল্যভাবে দেখানো হয়েছে। মেগাস্থিনিস বর্ণিত গাঙ্গেয়, এবং কলিঙ্গের ৩টি শাখা 'গাঙ্গেয় কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত ও মধ্যকলিঙ্গ' নামক মোট ৪টি স্বতন্ত্র জনপদ ও জনগোষ্ঠী এই গঙ্গারাষ্ট্রের মধ্যে পড়ে। এর মধ্যে প্রকাণ্ড রাজ্য হিসাবে বর্ণিত মধ্য-কলিঙ্গই আসল কলিঙ্গ, যার সৈন্যবল পঞ্চাল, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতির সমান। এক্ষেত্রে একটি জনগোষ্ঠীমাত্র নয়, GANGARIDAI একটি জাতি (Nation) ও রাষ্ট্রের নাম।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে পূর্বস্থলীই হল গাঙ্গেয়কলিঙ্গের রাজধানী 'পর্তেলিস'। কেউ কেউ আবার পর্তেলিসকে 'বর্ধমান' বলে মনে করেন। যাহোক, রাজমহল থেকে সরস্বতী-কংসাবতী পথে, পশ্চিমের প্রাচীনতম গঙ্গাধারাটি যে একদা প্রবাহিত হত একথা অনস্বীকার্য; সে হিসাবে তখন সেই প্রাচীন ধারার পূর্বদিকেই ছিল 'পূর্বস্থলী'; এ কথাও অস্বীকার করা চলেনা। ম্যাক্রিণ্ডলের সিদ্ধান্ত থেকে আমরা মগধ অর্থাৎ প্রাচ্যরাষ্ট্র এবং কলিঙ্গসহ গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাই। আর মেগাস্থিনিস, প্লিনি, সলিনাস প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের বিবরণ থেকে "গঙ্গাতীরবর্তী সমস্ত ভাগের" যুক্ত-রাজধানী হিসাবে পাটলিপুত্রের নাম, তথা সমগ্র প্রাচ্য-গঙ্গারাষ্ট্র হিসাবে 'মগধ ও গঙ্গারিডি' যুক্তরাষ্ট্রের বিষয় জানতে পারি। মগধের (প্রাসির) সর্বাধিক সেনাবল সমগ্র অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের পরিচায়ক, তথাপি উক্ত জনগোষ্ঠী ও জন-পদগুলির পৃথক পৃথক রাজধানী ও পৃথক সেনাবাহিনীর উল্লেখ থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মেলে। অর্থাৎ প্রাচীনকালে এ সমস্ত অঞ্চল ছোট বড় নানা কৌম বা স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত ছিল এবং মাঝে মাঝে তারা যুক্তভাবে এক একটি জনসঙ্ঘ (কন্‌ফেডারেশন) ও জাতি (নেশন) গঠনের পথে অগ্রসর হত। তাই আপিয়ান মগধসম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে সিন্ধুতীরবর্তী জনসঙ্ঘের রাজা বলে বর্ণনা করেছিলেন।

প্রাচ্যরাষ্ট্রের ন্যায়, গাঙ্গোপদ্বীপে গঙ্গারাষ্ট্রগঠন ও সভ্যতাস্থাপনের সূত্রপাত হয়েছিল অন্ততঃ আরো পাঁচ-ছ শ বছর আগে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে; সুতরাং এখানকার সেই সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতা ক্রমপক্ষে আড়াই হাজার বছরের পুরাণো। আড়াই হাজার বছরের কোন ইতিহাস নেই—একথা বলা ঠিক হবে না। অনুশীলনের মাধ্যমে সেই ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনে আমাদের সর্ব-শুভশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

মহাভারতে কর্বট জাতির কথা আছে। ডঃ অতুল সুরের মতে, কৈবর্তগণ সেই কর্বটদের বংশধর। কলিঙ্গী, কর্বট, কিম্বর্ত, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির উৎস একই। বর্তমান ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিমে প্রাচীন সরস্বতী-কংসাবতী পর্যন্ত ভূখণ্ডে কৈবর্ত ও মাহিষ্যগণের সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান। বঙ্গদেশের চাষীকৈবর্তগণ বর্তমানে মাহিষ্য হিসাবে তাঁদের পূর্বনামে রূপান্তরিত হয়েছেন। একদা মেদনীপুর পর্যন্ত ভূভাগ কলিঙ্গের অধিকারে ছিল। সে হিসাবে প্রাচীন গাঙ্গোপদ্বীপের প্রাকৃতিকসীমায় অন্তর্বর্তী এই কলিঙ্গীদের সঙ্গে, বর্ধমান জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে গাঙ্গেয়দের নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ' জনগোষ্ঠী। পূর্বস্থলীতে তাদের স্বতন্ত্র রাজধানীর উল্লেখ আমরা পেয়েছি। হিমালয়ান জাতিগুলির মধ্যে মকোকলিঙ্গ শব্দটি প্রাচীন মাহিষক-কলিঙ্গ নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আবার পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, সুদূর ইন্দোনেশিয়ায় ভারতোদ্ভব 'মাহিষ-কোবো' জাতির সঙ্গে এখানকার মাহিষ্য ও কৈবর্তদের সম্পর্ক আছে। পক্ষান্তরে, রাজস্থানের অধিবাসীদের পদবীর সঙ্গে এখানকার মাহিষ্যদের পদবীর সদৃশ্য থেকে রাজপুত ও মাহিষ্যদের সম্পর্ক এবং মকোকলিঙ্গীদের সম্পর্কও অমূলক নয় এবং বঙ্গদেশে চাষীকৈবর্তগণের মাহিষ্য নামে রূপান্তর সর্বৈব সত্য। সুতরাং এই কৈবর্ত ও মাহিষ্যগণ এবং রাঢ়ীগণ মেগাস্থিনিস ও প্লিনি বর্ণিত 'গঙ্গারিদেস-কলিঙ্গী' জনগোষ্ঠীর বংশধর।

এছাড়াও গঙ্গাসাগরসঙ্গমের আর একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠীকে মূল 'গঙ্গারিডি-জনগোষ্ঠী' (Tribe of the Gangaridae) বলা হয়েছে। গাঙ্গোপদ্বীপে অর্থাৎ দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে সর্বপ্রথম বসতি পত্তনকালে তাদের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য ছিল তা অনস্বীকার্য। তাদের রাজা (দলপতি) বাস করতেন গঙ্গানগর (City of Gange) নামক গাঙ্গেয় সমুদ্রবন্দরে। অর্থাৎ, তাদেরই তত্ত্বাবধানে একদা সাগরদ্বীপে প্রাচীন গঙ্গাসাগরসঙ্গম-তীর্থনগরে গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক

সমুদ্র-বাণিজ্যের কেন্দ্র। এ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী হিসাবে প্রথম থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সংখ্যাধিক্য ও আঞ্চলিক প্রাধান্য এখনও বেশী। রাজবংশী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, নমঃশূদ্র, হৈহয়ক্ষত্রিয়, কৈবর্ত এবং আরও অনেক প্রতিবেশীর সমন্বয়ে প্রাচীনকালে এই পৌণ্ড্রযোদ্ধাগণ সাগরদ্বীপকে কেন্দ্র করে, বৃহত্তর উপবঙ্গে মূল গাঙ্গেয়-জনপদের পত্তন করেছিল। তারপর কলিঙ্গের সঙ্গে যুক্তভাবে গঙ্গারাষ্ট্র এবং মগধের সঙ্গে প্রাচ্য-গঙ্গারাষ্ট্র নামক কনফেডারেশনের শরিক হয়েছিল। এভাবে বঙ্গোপসাগরকূলের একটি জনগোষ্ঠী প্রাচীনতম বাঙালীরাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং কলিঙ্গ ও মগধের সমন্বয়ে বৃহত্তর ভারতরাষ্ট্রের অংশীদাররূপে, আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হিসাবে বিশ্বসভ্যতায় নিজেদের অবদান সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। তাই সেই বাঙালী হিসাবে আমরা সকলেই মহান গঙ্গারিডি জাতির (Nation of Gangaridae) গৌরবের উত্তরাধিকারী। আর গঙ্গারিডি সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনকারী উপসাগরকূলের সেই পৌণ্ড্রযোদ্ধাগণ বিবর্তিত অবস্থায় ক্রমান্বয়ে জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, সেখ-মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে এবং বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এখনও আমরা সেই গাঙ্গোপদ্বীপের গঙ্গাতীরেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কলকাতায় গঙ্গাবন্দরের স্থানবদল করেছি। এই বন্দরকে কেন্দ্র করে ভারত-সংস্কৃতি তথা বিশ্বসভ্যতায় বাঙলার অবদান এখনও অব্যাহত আছে।

শৌর্য-সম্পদে গঙ্গারিডি জাতি

প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে পদাতিক, রথ ও অশ্ববাহিনীর প্রচলন সব দেশেই ছিল; কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের রাজ্যসমূহে রণহস্তীবাহিনী ছিল ট্যাঙ্কবাহিনীর মত। এই হস্তীযুদ্ধ এবং নৌযুদ্ধেও গঙ্গারিডি অর্থাৎ নিম্নবঙ্গবাসীরা ছিল পারদর্শী। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে, গঙ্গারিডিদের বিশালকায়-রণহস্তী প্রচুর ছিল, সেজন্য কোন বিদেশী রাজা এদেশ জয় করতে পারেনি; কারণ অন্যান্য জাতিসমূহ সেই অত্যধিক শক্তিশালী অসংখ্য রণহস্তীর কথা শুনে ভয় পেত। ডিওডোরাস তাঁর বিশ্ব ইতিহাসে মেগাস্থিনিসের এই উক্তি সমর্থন করেছেন এবং আরও সুস্পষ্টরূপে লিখেছেন যে, ম্যাসিডনবাসী আলেকজাণ্ডার প্রায় সমগ্র এশিয়া জয় করেও কেবল গঙ্গারিডিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বিমুখ হয়েছিলেন; কারণ তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকে পরাস্ত করে সমগ্র সৈন্যবলসহ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন যে গঙ্গারিডিদের সর্বাপেক্ষা রণনিপুণ চার

হাজার হস্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে একথা শুনেই তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য গঙ্গারিডিদের প্রশংসনীয় পরাক্রমের সার্টিফিকেটস্বরূপ। ইতিহাসের নির্মম সত্যরূপে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পশ্চাদপসরণের এই কারণটিকে প্রধান কারণ হিসাবে ধরে নিতেই হয় তৎকালীন বিদেশীয় লেখকগণের বর্ণনা থেকে। ডিওডোরাস আরও লিখেছেন যে, বিশাল আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার ভিত্তিতে দক্ষিণের দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। এই দেশ বহুসংখ্যক জাতি-দ্বারা অধ্যুষিত, তাদের মধ্যে 'গঙ্গারিডি জাতি' বৃহত্তম। প্রাসী ও গঙ্গারিডিকে তিনি একাধিক রাজ্য, কিন্তু একটি জাতি (the dominions of the nation of the Braisioi and the Gandaridai) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই যুক্তরাজ্যের রাজা স্যান্ড্রামেস; তাঁর ২০,০০০ অশ্বারোহী. ২০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ রথ ও ৪,০০০ রণহস্তী শিক্ষণপ্রাপ্ত ও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত থাকত।

কার্টিয়াস রুফাস (১ম শতক) তাঁর 'লাইফ অব আলেকজাণ্ডারে' লিখেছেন যে, এ্যাগ্রামেস ছিলেন গঙ্গারিডি ও প্রাসী নামক দুই জাতির অধীশ্বর (two nations, the Gangaridae and the Pharrasii) তাঁর ছিল ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ চার ঘোড়ার রথ ও ৩,০০০ রণহস্তী। এই Agrammes বা Xandrames 'উগ্রসেন' নামের বিকৃতি। তিনি ছিলেন 'উগ্রসেনের পুত্র' অর্থাৎ মগধরাজ মহাপদ্মনন্দের পুত্র 'ধননন্দ'। প্লুটার্ক 'গঙ্গারিডির রাজা ও প্রাসীর রাজা এক ব্যক্তি ছিলেন একথা বলেননি; তিনি বলেছেন, Kings of the Gandaritai and the Praisioi, তিনি উভয় রাজার সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বলেছেন—৮০,০০০ অশ্ব, ২০০,০০০ পদাতিক, ৮,০০০ রথ, ৬,০০০ রণহস্তী; সুতরাং এ পর্যন্ত আমরা গঙ্গারিডি নামে একটি যুক্তরাজ্য ও জাতি (Nation) এবং আরও একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী (tribe) ও জনপদের (State) পরিচয় পেয়েছি। সলিনাসের মতে, উক্ত জনগোষ্ঠীর সৈন্যসংখ্যা ১,০০০ অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী ও ৬০,০০০ পদাতিক। সলিনাস ও প্লিনির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, প্রাসী অর্থাৎ প্রাচ্য জাতির (প্রাচ্য-গঙ্গারাষ্ট্রের) রাজা বেতন দিয়ে সর্বদা ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ৯,০০০ হস্তী রাখেন; এখানেও মগধসম্রাট ধননন্দের সৈন্যবাহিনীর কথাই বলা হয়েছে এবং তৎপূর্বে স্বতন্ত্র গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পৃথক সৈন্যবাহিনীর কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রাসীর সঙ্গে গঙ্গারিডিদের কনফেডারেশন

গঠনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। প্রাসী অর্থাৎ মগধ সাম্রাজ্যকে গঙ্গারিডি যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করায় নামভূমিকায় গঙ্গারিডি-জনগোষ্ঠীর সুখ্যাতি বেড়েছে এবং তাম্রলিপ্ত ও কলিঙ্গের সঙ্গে গঙ্গারিডির কনফেডারেশন গঠনের কথাও আগে বলা হয়েছে।

সেকালে বহির্ভারতে গ্রীস, রোম, মিশর প্রভৃতি দেশে গঙ্গারিডিদের শৌর্যসম্পদের কথা সুপ্রচারিত হয়েছিল ; এদের গৌরবগাথায় বিমুগ্ধ হয়ে, রোমদেশীয় মহাকবি ভার্জিল (খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতক) লিখেছেন—

In foribus pugnam ex auro solidoque elephanto
Gangaridum faciam, Victorisque arma Quirini."
(Virgil, Georg. III 27)

ইংরাজী অনুবাদ—

"On the doors will I represent
In solid gold and ivory.........
The battle of the Gangaridae."

অর্থাৎ, "আমার দুয়ার ভরি রাখিব উৎকীর্ণ করি
নিটোল স্বর্ণ আর গজদন্ত সনে......
গঙ্গারিডি রণে।"
(বঙ্গানুবাদ : সরোজকুমার দত্ত)

আরও একজন রোমক কবি ভ্যালেরিয়াস ফ্লাক্কাস তাঁর 'আর্গোনটিকা' কাব্যে লিখেছেন যে, পৌরাণিক বীর জ্যাসনের বিরুদ্ধে গঙ্গারিডিরা কৃষ্ণসাগরকূলে সৈন্য সমাবেশ করেছিল। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতকে ভারতীয় মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশে' এই অঞ্চলের নৌযুদ্ধনিপুণ অধিবাসীদের কথা উল্লেখ করেছেন। এইসব বর্ণনা থেকে আমরা গঙ্গারিডিদের পরাক্রমের কথা জানতে পারি। এছাড়া 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থকার (একজন অজ্ঞাতনামা গ্রীক-নাবিক) ১ম শতকে সরেজমিনে গঙ্গে বন্দর পরিদর্শন করে লিখেছেন যে, বৃহত্তম গঙ্গানদী যেখানে সাগরে পড়েছে, তার নিকটবর্তী নদীতীরে 'গঙ্গে' নামক হাট-শহরে তেজপাতা, সুগন্ধি গাঙ্গেয় অঞ্জনতৈল, প্রবাল, মুক্তা, সর্বাধিক উৎকৃষ্ট গাঙ্গেয় মসলিন প্রভৃতি ব্যাপকভাবে বেচাকেনা চলে। শোনা যায়, এখানে একটি সোনার খনি আছে এবং এখানে ক্যাল্টিস (কলিত) নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর এই বর্ণনা থেকে আমরা গঙ্গারিডিদের সম্পদশালী জাতিরূপে দেখতে পাই।

টলেমির মতে, উক্ত গঙ্গে নগর গঙ্গারিডিদের রাজধানী এবং সেখানে তাদের রাজা বাস করেন। মেগাস্থিনিস, ডিওডোরাস, কার্টিয়াস, প্লুটার্ক, স্ট্রাবো, প্লিনি, আরিয়ান, সলিনাস প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ নন্দ ও মৌর্য আমলের কথা বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু পেরিপ্লাস গ্রন্থে ও টলেমির বিবরণে খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতকের কথা বর্ণিত হয়েছে, যে সময় শুঙ্গ ও কুষাণ বংশীয়রা উত্তরভারতে রাজত্ব করতেন। তখন প্রাচ্য-কলিঙ্গ-গঙ্গারাষ্ট্রের কনফেডারেশনের অস্তিত্ব ছিলনা এবং উক্ত সুবৃহৎ গঙ্গারাষ্ট্রের সেই ব্যাপ্তিও ছিলনা। তাই টলেমি তাঁর ম্যাপে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপগুলিকে গঙ্গারিডিদের স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং সাগরদ্বীপে সঠিকভাবে গঙ্গে বন্দরের স্থান নির্দেশ করেছেন। তিনি পৃথক পৃথকভাবে প্রধান নগর হিসাবে গঙ্গে, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পাটলিপুত্র প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাজ্যমধ্যে নির্দিষ্ট করেছেন। প্রাসী অর্থাৎ মগধের রাজা ধননন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের কথা আমরা পাটলিপুত্রের অধিপতি হিসাবে সঠিক জানতে পারি, গাঙ্গেয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিপতি হিসাবে ধননন্দ অভিহিত হয়েছিলেন ; কিন্তু গঙ্গে নগরের অধিপতি অর্থাৎ গঙ্গারিডিদের রাজা এবং অন্যান্য বহু জনগোষ্ঠীর রাজাদের নাম জানা যায় না। সে সময় এসব অঞ্চলে রাজতন্ত্র অপেক্ষা দলপতি-শাসনব্যবস্থা অধিক প্রচলিত ছিল। মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থাদিতে পুণ্ড্রগণের প্রতিপত্তির কথা জানা যায় ; পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য একদা উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণে উপসাগরকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বোঝা যায়। নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় আবহমানকাল পুণ্ড্রদের সংখ্যাধিক্য বর্তমান। গোষ্ঠীশাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাধিক্যের গুরুত্ব সর্বাধিক ; সে হিসাবে এদেরই প্রাধান্য ছিল এ অঞ্চলে। গঙ্গে বন্দর তথা সাগরদ্বীপকে কেন্দ্র করে এরাই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করেছিল এবং বিদেশীদের নিকটে গাঙ্গেয় জাতি বা গঙ্গারিডি নামে অভিহিত হয়েছিল। তারপর তারা বৃহদ্বঙ্গে বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্রের শরিক হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের বৃহত্তম জাতি গঠনে সহযোগী হয়েছিল।

কালিদাস উত্তরকালে এই পুণ্ড্র ও বঙ্গদিগকে একত্রে বঙ্গজাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন বোঝা যায়। তার আগে, মৌর্য আমলেও পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা জানা যায়। সম্প্রসারিত বঙ্গদেশে বঙ্গদের সঙ্গে পুণ্ড্র ও সুহ্মরা ক্রমান্বয়ে মিশে গিয়ে একদা সমগ্রভাবে বাঙ্গালী মহাজাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ যেমন 'ট্রাইব অব গঙ্গারিডি'র বংশধর, তেমন 'নেশন অব গঙ্গারিডি'র বংশধর প্রায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যেমন 'ইন্ডিয়া' নামের উল্লেখ

নেই, তেমন 'গঙ্গারিডি' নামেরও উল্লেখ নেই। অবনমনের ফলে গঙ্গাবন্দর ও নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল বিদেশী বণিকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় এবং গাঙ্গেয়দের বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, স্বদেশে ও বিদেশে গাঙ্গেয়দের প্রভাব বিনষ্ট হয় এবং কালক্রমে গঙ্গারিডি নামটিও অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। নাহলে আন্তর্জাতিক ভাষায় বৃহদ্বঙ্গের নাম হিসাবে 'গঙ্গারিডি' নামটি আজও বহাল থাকত। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় আবার আমরা সমুদ্রের দিকে সরে আসছি—হলদিয়ায় শিল্পনগরী ও ফলতায় মুক্ত-বাণিজ্য এলাকা স্থাপন করেছি, গঙ্গাসাগরতীর্থের মেলাক্ষেত্রকে পুনরায় নগর-সজ্জায় সজ্জিত করছি—একদিন হয়ত গঙ্গানগরের পুনরুত্থানে সাগরদ্বীপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমুদ্রবাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে বিশ্বসভ্যতায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি এই গাঙ্গেয়-বাঙ্গালীদের অবদান আরো বৃদ্ধি পাবে।

ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে স্থানবাচক 'গঙ্গা' ও 'লৌহিত্য'

ডঃ সুকুমার সেন প্রাচীন ব্যাকরণ শাস্ত্রে স্থানবাচক 'গঙ্গা' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন—"গঙ্গারিদই ছিল তাদেরই এক দল যাদের বিষয় ছিল গঙ্গা (ভূমি) অর্থাৎ গাঙ্গেয় উপত্যকা। প্রাচীন বৈয়াকরণদের উদাহরণ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' থেকে গাঙ্গের ভূমি অর্থে গঙ্গা শব্দের প্রয়োগ অনুমান করা যায়। গোপালকদের গ্রাম (—অর্থাৎ ব্রজধাম—) হল 'ঘোষ', সাধারণত নদীতীরে অবস্থিত; সুতরাং অল্পবিস্তর যাযাবর। পতঞ্জলির একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। 'গমিষ্যামো ঘোষান্ পাস্যামঃ পয়ঃ শয়িষ্যামহে পুতীকতৃণেষু'—অর্থাৎ 'আমরা যাব ঘোষে, খাব দুধ, শোব নরম ঘাসে'। খ্রীষ্টপূর্বকালে গঙ্গার ভাটি অংশ (গাঙ্গ অনূপ) কোথাও কোথাও 'উন্মত্তগঙ্গ' এবং 'লোহিতগঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। যেখানে গঙ্গা বিস্তীর্ণ ও প্রচণ্ড—বিশেষ করে বর্ষায় ও শরতে—সে অঞ্চল 'উন্মত্তগঙ্গ', অনুমান করতে পারি। এখনকার দিনের নদীনাম 'মাতলা' এই নামেরই যেন প্রতিধ্বনি। বারানসীর নীচে থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র গাঙ্গেয় ভূমিকে পতঞ্জলির সময়ে 'উন্মত্তগঙ্গ' বলা অযথার্থ ছিল না। শোন, বরাকর, অজয় ও দামোদর—প্রধানত এই চার নদীই সেকালের বঙ্গভূমিতে প্রচুর লাল জল ঢেলে এসেছে; সুতরাং উন্মত্তগঙ্গের নিম্নার্ধকে যথার্থই লোহিতগঙ্গ বলা যায়।"

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দার্শনিক ঋষি পতঞ্জলি পাণিনি-ভাষ্যকার ও যোগশাস্ত্র-সূত্রকার হিসাবে খ্যাত। তাঁর রচিত পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্য 'পাতঞ্জল-মহাভাষ্য' এবং তাঁর রচিত যোগশাস্ত্র 'পাতঞ্জল দর্শন' নামে

অভিহিত। আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের আগে পঞ্জাবে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণসূত্রকার পাণিনির জন্ম হয়; ইনি ধাতুপাঠ, গণপাঠ প্রভৃতি ব্যাকরণ শাস্ত্র রচনা করেন। এঁর ব্যাকরণ 'পাণিনি-ব্যাকরণ' নামে খ্যাত। পাণিনি-পতঞ্জলির সময়ে যে অঞ্চলকে 'লোহিতগঙ্গ' বলা হয়েছে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর মহাভারতে সেই অঞ্চলকে বলেছিলেন 'লৌহিত্য দেশ'। শোন, বরাকর, অজয় ও দামোদর থেকে প্রচুর লাল জল যেমন পশ্চিম দিকের রাঢ়ভূমি থেকে বয়ে এসেছে, আবার পূর্বদিকে প্রবাহিত নদীটির নামও লৌহিত্য। সে হিসাবে মধ্যবর্তী এই নিম্নগাঙ্গেয় এলাকা লৌহিত্য দেশরূপে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে—

"বীর্যবান পাণ্ডুনন্দন বিদেহ দেশে অবস্থান করিয়াই ইন্দ্রপর্বত সন্নিহিত কিরাতদিগের সাতজন অধীশ্বরকে পরাজিত করিলেন, পরে স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডাধার ও অপরাপর মহীশ্বরগণকে বিজিত করিয়া তাঁহাদিগের সকলের সহিত সমবেত হইয়াই গিরিব্রজে উপনীত হইলেন, এবং জরাসন্ধনন্দন সহদেবকে সান্ত্বনাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া সকলকেই সঙ্গে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে ভারত! পাণ্ডবপ্রবর বৃকোদর চতুরঙ্গ বলভরে ধরণীকে যেন কম্পমান করতঃ শত্রুনাশন কর্ণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে সংগ্রামে নির্জিত ও বশীকৃত করিয়া পর্বতবাসী রাজগণকে পরাজয় করিলেন। মহারাজ! অনন্তর তিনি মোদাগিরিস্থ অতি বলশালী রাজাকে বহু বীর্য সহকারে মহাসমরে নিহত করিলেন; পরে পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ নিবাসী রাজা মহৌজা, প্রখর পরাক্রান্ত ও বলসম্পন্ন এই দুই বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকেও পরাভূত করিলেন। মহাবল পবননন্দন এইরূপে বহুবিধ দেশ বিজয় ও সর্বত্র হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া লৌহিত্য দেশে উপস্থিত হইলেন এবং সাগরতীর প্রভৃতি জলপ্রধান দেশবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নরপতিদিগকে বিবিধ রত্ন ও চন্দন অগুরুবস্ত্র কম্বল মণি মুক্তা কাঞ্চন রজত বিদ্রুম প্রভৃতি মহামূল্য বস্তুজাত কর প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। ম্লেচ্ছাধিপেরা তৎকালে কোটি কোটি সংখ্যক সুবিপুল ধনবর্ষণ দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তখন ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়া সেই সমস্ত ধন ধর্মরাজকে অর্পণ করিলেন।"

(মহাভারত, সভাপর্ব, বর্ধমান রাজবাটী-বঙ্গানুবাদ-২, পৃঃ ৫৩৪)।

অতএব মহাভারতের 'লৌহিত্য' এবং পতঞ্জলির সময়ের 'লোহিতগঙ্গ' ও গ্রীকদের 'গঙ্গারিদই' অভিন্ন। ভীম লৌহিত্য দেশে উপস্থিত হয়ে, "সাগরতীর প্রভৃতি জলপ্রধান দেশবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নরপতি" গণের নিকট থেকে কর আদায় করেছিলেন—এই বর্ণনায় নিম্নবঙ্গ অর্থাৎ সুন্দরবনের জলাভূমির বিষয় আরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানকার দলপতি বা নৃপতিগণকে ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। সুতরাং সুন্দরবন অঞ্চলকে পাণ্ডববর্জিত দেশ বলা চলেনা। উপসাগরকূলবর্তী ব্রাহ্মণবিহীন অরণ্য অঞ্চলে উপনিবিষ্ট যোদ্ধৃজনগোষ্ঠীসমূহ ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকলাপমুক্ত ছিল বলে, মহাভারতে এদের ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা হয়েছে। পেরিপ্লাসের বর্ণনায় এদেশের রপ্তানিদ্রব্যগুলির মধ্যে সুগন্ধি গাঙ্গেয় অঞ্জনতৈল, প্রবাল, মুক্তা, সর্বোৎকৃষ্ট গাঙ্গেয-মসলিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদেশের ম্লেচ্ছ দলপতিদের দেওয়া ভীমের উপঢৌকনগুলির সঙ্গে এই রপ্তানিদ্রব্যগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

প্রাচীন ব্যাকরণকারগণের উদাহরণ থেকে আমরা স্থানবাচক গঙ্গা-শব্দের ব্যবহার পেয়েছি। সেই গঙ্গাভূমির অধিবাসীরা একদা গঙ্গাল বা গঙ্গার নামে অভিহিত ছিল ; আর গ্রীকরা ঐ গঙ্গার-শব্দের সঙ্গে 'ইদই' যোগে গঙ্গারিদই শব্দটি যে সৃষ্টি করেছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। নিম্নবঙ্গে 'সাগরতীর প্রভৃতি জলপ্রধান' যে সব অঞ্চল মহাভারতে লৌহিত্য দেশরূপে বর্ণিত হয়েছে, পতঞ্জলির সময়ে সে সব অঞ্চলকে বলা হয়েছে লোহিতগঙ্গ, আর পেরিপ্লাসে ঐ একই অঞ্চল 'গঙ্গে' নামে চিহ্নিত হয়েছে। তাম্রলিপ্তের পর সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে উক্ত গঙ্গা-বন্দর একদা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। সেকালে স্থলপথ অপেক্ষা জল-পথের প্রয়োজনীয়তা অধিক থাকায়, নিম্নবঙ্গের নাব্য এলাকা একদা উত্তরের স্থলপথপ্রধান-অঞ্চল অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভে সক্ষম হয়েছিল এবং শৌর্যসম্পদের অধিকারীরূপে নিম্নবঙ্গে গৌরবময় যুগের সূচনা করেছিল। এখানকার কৃষিজীবী, শ্রমজীবী ও ব্যবসায়জীবী অধিকাংশ মানুষ ছিল সাহসী ও শক্তিশালী, অর্থাৎ কিছুটা ক্ষত্রিয়ধর্মী ; কিন্তু আর্য প্রভাবের বাইরে অবস্থিত থাকায় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কারমুক্ত। পতঞ্জলি বর্ণিত 'লোহিতগঙ্গ ও উন্মত্তগঙ্গ' অর্থাৎ সমগ্র গাঙ্গোপদ্বীপ জুড়ে এরা রাজ্যবিস্তার করেছিল এবং মগধ ও কলিঙ্গের সঙ্গে যুক্তরাজ্য গঠনে সক্ষম হয়েছিল।

প্রথম পর্যায়ে গঙ্গারিডি গবেষণা

বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ঋষি বঙ্কিমের উদাত্ত আহ্বান 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ' করার মত। বাংলা ১২৮৭ সালে 'বঙ্গদর্শনের' অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা"য় তিনি লিখেছিলেন—"যে জাতির পূর্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেনহিম্ ও ওয়াটর্লু—ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না! তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল—অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না। ...... বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়,... বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইঁহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই? আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।"

এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্যসম্রাট নিজে ইতিহাস-গবেষণার কাজ সুরু করে দিয়েছিলেন আগে থেকেই। বাংলা ১২৯১ সালে 'প্রচার' পত্রিকার শ্রাবণ-সংখ্যায় তিনি "বাঙ্গালার কলঙ্ক" নামক রচনায় 'গঙ্গারিডি' সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন—"মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস, গঙ্গারিডি (Gangaridae) নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ জনপদের স্থান নির্ণয়ে

তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেখানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্বসীমা। তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের ঐ Gangaridae শব্দ গঙ্গারাঢ়ী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। গঙ্গার উপকূলবর্তী রাষ্ট্রকে লোকের গঙ্গারাষ্ট্র বলাই সম্ভব—সুরাষ্ট্র (সুরট), মধ্যরাষ্ট্র (মেবাড়), গুর্জরাষ্ট্র (গুজরাট) প্রভৃতি দেশের নাম যেরূপ রাষ্ট্র শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইযাছে, ইহাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাট্ শব্দ বা রাঢ শব্দ প্রচলিত থাকিবে। সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ "গঙ্গাতীরস্থ" শব্দের পরিবর্তে অনেকে "তীরস্থ" বলে। ত্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম "তীরভুক্তি।" এ স্থলেও গঙ্গাশব্দ পরিত্যাগ হইয়া কেবল "তীর" শব্দ আছে। গঙ্গারাঢ়ও সেইজন্য এখন "রাঢ়" শব্দে দাঁড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে এই রাঢ দেশ একটি পৃথগ্রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস বলেন যে, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তি সৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন যে, স্বয়ং সর্বজয়ী অলেকজাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্যের ভয়ে আলেকজাণ্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না।··· গঙ্গারাঢ়ী নাম আমরা নূতন গড়িলাম না, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। যেখানে দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাসীদিগকে মেগাস্থিনিস Gangaridae বলেন, সেই প্রদেশবাসীদিগকেই লোকে এখন রাঢ়ী বলে, আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাঢ়ী নামের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। ······গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। একথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে, আমরা গঙ্গারাঢ়ী নাম নূতন গড়ি নাই।······এই যে অনন্তবর্মা বা কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর পূর্ব গৌরবের এক চিরস্মরণীয় প্রমাণ। উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ, ইনিই তাহার আদিপুরুষ। কেহ কেহ

বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়েরা দক্ষিণদেশ হইতে উড়িষ্যায় আসিয়াছিল এবং চোরঙ্গা বা চোরগঙ্গা নামে একজন দাক্ষিণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন করেন। এ কথাটি মিথ্যা। এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমময় রাজবংশীয়েরা যে বাঙ্গালী ছিলেন, এই কথা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাই সেপক্ষ সমর্থন করেন। উইলসন সাহেবের কথিত গ্রন্থে কথিত (৮২) পৃষ্ঠাতেই যে একখানি শাসনের উল্লেখ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাঢী কোলাহলই উড়িষ্যাবিজেতা এবং গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ। তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবে না। ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরীর মন্দির ও কোণার্কের আশ্চর্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত।”

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যে গঙ্গারিডি জাতির উত্তরসূরী হিসাবে বাঙ্গালীদের মনে গৌরববোধের উদ্রেক করে। ‘গঙ্গারিডি’ শব্দের সঙ্গে ‘গঙ্গারাঢী’ শব্দের অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকায়, প্রথম অনুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যকে স্বাভাবিক কারণেই বাঙালী ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ গঙ্গারিডি গবেষণায় আরও একটু অগ্রসর হয়ে, তাঁর “গৌড় রাজমালা”য় ‘গঙ্গরিডি’ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, গঙ্গরিডই রাজ্য যে রাঢ়দেশে সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) এবং বঙ্গ নিশ্চয়ই ‘গঙ্গরিডই’ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং কলিঙ্গও এক সময়ে এই রাজ্যের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর ‘যশোহর-খুলনার ইতিহাসে’ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘গঙ্গারাঢ়ী’ উৎস-নামটি মেনে নিয়ে এবং এই রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে রমাপ্রসাদ চন্দের অভিমতকে গ্রহণ করে লিখেছেন যে, গঙ্গারিডি যে একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল, তাতে সন্দেহ নেই; বঙ্গদেশ এর অন্তর্গত ছিল। সুতরাং উপবঙ্গ বা যশোহর-খুলনা এই গঙ্গরাষ্ট্র বা গঙ্গারিডি দেশেরই অংশ মাত্র। সংস্কৃতিবিদ বিনয় ঘোষ তাঁর “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” গ্রন্থে লিখেছেন যে, গঙ্গারিডি নাম মনে হয় সংস্কৃত গঙ্গারাষ্ট্র, গঙ্গারাঢ়া বা গঙ্গাহৃদয় নামের গ্রীকবিকৃতি। টলেমি বলেছেন গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল এবং তাদের নিজস্ব রাজধানী ছিল গাঙ্গী (Gange)। গঙ্গানগর বলে কোন নগর ছিল বোঝা যায়। টলেমি এই গঙ্গানগরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাতে তার ভৌগোলিক অবস্থান

সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। মনে হয় বর্তমান গঙ্গানগর বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমের কাছে এই গঙ্গানগর ছিল।

সাগরদ্বীপে গঙ্গানগরের অবস্থিতি সম্পর্কে বিনয় ঘোষ ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, বর্তমান দেগঙ্গায় ছিল সেই গঙ্গে বন্দর। আবার 'গৌড়কাহিনী'-গ্রন্থকার শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ বলেছেন যে, গঙ্গারিডি শব্দটি 'গৌড়' হওয়াই সম্ভব। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, কুমার-হরিণঘাটা নদীর মোহনায় ছিল গঙ্গে বন্দর। ইতিহাস-গবেষক কল্যাণ রুদ্র সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার হরিনারায়ণপুরে গঙ্গে বন্দরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন ('পুরাতনী,' সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪)। অভিমতগুলি বিতর্কিত হলেও, স্বরবিজ্ঞানভিত্তিক (Phonetics) আলোচনা অতিক্রম করে গঙ্গারিডি গবেষণায় বিজ্ঞানসম্মত অগ্রগতি হতে থাকে। গঙ্গারিডির মূল অবস্থানক্ষেত্র গবেষকদের দৃষ্টিতে রাঢ়দেশ থেকে উপবঙ্গের দিকে ক্রমশঃ সরে আসতে থাকে। গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের প্রত্যেকের অভিমত বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল যে, তাঁদের প্রত্যেকের মতে গঙ্গার শেষাংশে গঙ্গারিডিদের জনপদ। উপদ্বীপ বা বদ্বীপ গঠনের সুরু থেকেই তার তিনদিকে (অর্থাৎ সকলপাশে) জলধারার অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক। সে হিসাবে গাঙ্গোপদ্বীপের দুদিকে নদী ও একদিকে সমুদ্র প্রথম থেকেই আছে। প্রাচীন ভারতের মানচিত্রগুলি সেই পরিচয় প্রদান করে। গাঙ্গোপদ্বীপের একপাশে গঙ্গাখাত ছিলনা, এমন ঘটনা অবাস্তব। ভূবিজ্ঞানসম্মত কারণেই এরূপ ঘটা সম্ভব নয়। তাহলে, প্রাচীনকালে যে নামই থাকুক, ভাগীরথী ও পদ্মা-খাতের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। উভয় নদী চিরকাল গঙ্গানদী হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। প্রাকৃতিক কারণে পূর্বদিকের খাতটি হয়ত একদা মজে গিয়েছিল অথবা ক্ষীণ কলেবরে কোন রকম অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল; তারপর উত্তরকালে পদ্মা নামে পুনরায় প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই সাধারণ দৃষ্টিতে পদ্মা অর্বাচীন; কিন্তু বুড়ীগঙ্গা, বড়গঙ্গা প্রভৃতি নাম এই প্রাচীন গঙ্গাখাতের সাক্ষ্য বহন করছে।

মেগাস্থিনিস ও ডিওডোরাসের উক্তি অনুসারে গঙ্গানদী যদি গঙ্গারিডিদের পূর্বসীমা হয়, তাহলে গঙ্গার পূর্বদিকের খাতটিকেই সেই সীমারূপে ধরতে হবে। কারণ তাঁরা পূর্বসীমা হিসাবে গঙ্গানদীর উল্লেখ করেছেন, কোথাও ভাগীরথী-জাহ্নবীর নাম করেননি। কিন্তু প্রথম অনুশীলনে মেগাস্থিনিস-ডিওডোরাসের উক্তি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গা বলতে

পশ্চিমের প্রধান ধারা ভাগীরথী-জাহ্নবীকেই ধরে নিয়েছিলেন এবং তার পশ্চিমে অবস্থিত রাঢ়দেশকে গঙ্গারিডি বলে অনুমান করেছিলেন। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি আবার নকসাসহযোগে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে গঙ্গানদীর পাঁচটি মোহনার অন্তর্বর্তী অঞ্চলকে অর্থাৎ গাঙ্গেপদ্বীপকে গঙ্গাবিডিদের রাজ্য হিসাবে দেখিয়েছেন; গঙ্গানদীর পূর্বদিকের খাতটি গঙ্গারিডির পূর্বসীমা এবং পশ্চিমের খাতটি পশ্চিমসীমা। এইপশ্চিমসীমায় ছিল ভাগীরথীর প্রাচীনতম ধারা; যে ধারাটি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণসীমা থেকে সুরু হয়ে রাজমহল-সাঁওতালপরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম দিয়ে নেমে এসে অজয়-দামোদর-রূপনারায়ণ-সরস্বতী-কংসাবতীকে সংযুক্ত করতে করতে বর্তমান হুগলী-মোহনার পশ্চিমদিকে কংসাবতী মোহনায় (কালিদাস-বর্ণিত কপিশা) সাগরে পড়ত; এই নদী সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় "বাংলার নদনদী"তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই খাতের নিম্নাংশ থেকে তৎকালে একদা স্বরস্বতী খাতটিও সম্ভবত বর্তমান হুগলীমোহনা দিয়েই সাগরে পড়ত। টলেমির সময়ে ঐ মুখটি ছিল সর্বাধিক প্রশস্ত। এছাড়া ঐ সময় ভাগীরথী-আদিগঙ্গা খাতটিও এই সরস্বতীর গা থেকে বেরিয়ে সাগরদ্বীপের মধ্য দিয়ে গঙ্গাসাগর মোহনায় সাগরে পড়ত। টলেমির ম্যাপ আমাদের এই সাক্ষাই দিচ্ছে। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আদিগঙ্গা-ভাগীরথী অপেক্ষা স্বরস্বতী প্রাচীন এবং সরস্বতী অপেক্ষাও প্রাচীন আরেকটি খাত আরো পশ্চিম দিয়ে বয়ে যেত; যাকে "প্রাচীন সরস্বতী" বলা যেতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে এবং প্রয়োজনবোধে মানুষের দ্বারা এভাবে নদনদীগুলির গতিপথ যুগ যুগ ধরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

টলেমি বর্ণিত গঙ্গার পঞ্চমোহনা

টলেমি সর্বপশ্চিমে প্রবাহিত প্রাচীনতম গঙ্গাখাতের মোহনার নাম দিয়েছেন ক্যাম্বিসাম (ল্যাটিন হরফে 'CAMBYSVM') অর্থাৎ 'কংসাবতী' মোহনা; এই মোহনা ১৮ ডিগ্রী ১৫ ফুট অক্ষাংশ ও ১৪৪ ডিগ্রী ৩০ ফুট দ্রাঘিমার সংযোগস্থলে অবস্থিত। টলেমির ম্যাপে এই ধারাটির নিম্নাংশ থেকে আরেকটি ধারা পূর্বদক্ষিণে বেরিয়ে এসে সাগরে মিশেছে, তার মোহনার নাম ম্যাগনাম (MAGNVM = বৃহৎ); এই মোহনা ১৮ ডিগ্রী ৩০ফুট অক্ষাংশ ও ১৪৫ ডিগ্রী ১৫ ফুট দ্রাঘিমার সংযোগস্থলে অবস্থিত। সম্ভবত এটি ছিল সরস্বতীমোহনা বা বর্তমান হুগলীমোহনা। এই দুই মোহনার মধ্যবর্তী স্থানে সমুদ্রকূলে

পালুরা (PALVRA) নামে একটি বন্দর। এই ধারা থেকে আরো একটি ধারা পূর্বদক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নেমে এসেছে, যার নাম ক্যাম্বেরিকাম (CAMBERICVM), এই ধারাটিই বর্তমানে মজে যাওয়া আদিগঙ্গার ধারা, অর্থাৎ বর্তমানে যেটি 'ধবলাটের খাল' নামে পরিচিত। টলেমির ম্যাপে এর অক্ষাংশ ১৮ ডিগ্রী ৪০ফুট এবং দ্রাঘিমা ১৪৬ডিগ্রী ৩০ফুট। এই মোহনার পশ্চিমতীরে ১৯ডিগ্রী ১৫ফুট অক্ষাংশ ও ১৪৬ ডিগ্রী দ্রাঘিমার সংযোগস্থলে গঙ্গারিডির রাজধানী গঙ্গে নগর (GAGE REGIA)। সর্বপশ্চিমের ধারাটির মত আরেকটি (৫ম) ধারা একই স্থান থেকে পূর্বদক্ষিণে নেমে এসেছে, এর মোহনার নাম এ্যান্টিবোল বা আন্তিবোলা (ANTIICIA)। এটিই পদ্মা-বুড়ীগঙ্গা-মেঘনার মুখ (অক্ষাংশ ১৮ ডিগ্রী ৩০ ফুট এবং দ্রাঘিমা ১৪৮ ডিগ্রী ৩০ ফুট)। দক্ষিণে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এর গা থেকে আরেকটি ধারা (৪র্থ) পশ্চিম-দক্ষিণে নেমে এসেছে, যার মোহনার নাম সিউদোস্তমাম (PSVDOSTOMVM), এটি হল হরিণঘাটার মোহনা (অক্ষাংশ ১৮ ডিগ্রী ৩০ ফুট এবং দ্রাঘিমা ১৪৭ ডিগ্রী ৪০ ফুট)। ক্যাম্বেরিকাম ও সিউদোস্তমামের মধ্যবর্তী স্থানে সমুদ্রকূলে আরেকটি বন্দরের নাম তিলোগ্রামাম (TILOGRAMVM)।

গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ প্রত্যেকেই গঙ্গানদীর শেষাংশে গঙ্গা-রিডিদের বাসস্থানের উল্লেখ করলেও টলেমি ব্যতীত তাঁদের মধ্যে আর কেউ গঙ্গার একাধিক মোহনার সুস্পষ্ট উল্লেখ করেননি। কিন্তু গাঙ্গোপদ্বীপের উদ্ভবকাল থেকে শতমুখী গঙ্গা অসংখ্য মোহনায় সাগরে মিশেছে। মহাভারতে গঙ্গার পঞ্চশত মুখের উল্লেখ আছে। এখনও নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা শিরা-উপশিরার মত অসংখ্য গাঙে-খালে ভরা। এর মধ্যে তৎকালীন সর্বপ্রধান পাঁচটিমাত্র মোহনার কথা টলেমি উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসবিদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এই পাঁচটি মোহনার বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, টলেমি বর্ণিত পশ্চিমের ধারাটি ভাগীরথী এবং পূর্বদিকের ধারাটি পদ্মা। নলিনীকান্তের মতে পশ্চিমের প্রথম মুখ (ক্যাম্বিসাম) তাম্রলিপ্তের নিকটবর্তী গঙ্গাসাগর মুখ। আর হেমচন্দ্রের মতে উক্ত প্রথম মুখ কালিদাস-কথিত কপিশা বা বর্তমান কাঁসাই মুখ। দ্বিতীয় (ম্যাগনাম) মুখটি নলিনীকান্তের মতে আদিগঙ্গা অথবা রায়মঙ্গল-হাঁড়িয়াভাঙা মুখ, আর হেমচন্দ্রের মতেও ওটা ভাগীরথীর সাগরমুখ। তৃতীয় মুখটি (ক্যাম্বেরিকাম) উভয়ের মতে হরিণঘাটা মুখ। চতুর্থ মুখ (সিউদোস্তমাম) নলিনীকান্তের মতে

দক্ষিণ-সাহাবাজপুর মুখ, আর হেমচন্দ্রের মতে পদ্মা-মেঘনার সম্মিলিত প্রবাহ মুখ। আর সর্বশেষ অর্থাৎ পঞ্চম মুখ (আস্তিবোলা) নলিনীকান্তের মতে সন্দীপ-চট্টগ্রাম মধ্যবর্তী মুখ, হেমচন্দ্রের মতে ওটা বুড়ীগঙ্গা মুখ।

কিন্তু, টলেমি দেখিয়েছেন পশ্চিমধারার (প্রাচীন সরস্বতীর) তিনটি মুখ এবং পূর্বদিকের ধারাটির (পদ্মার) ছুটি মুখ। অতএব যেহেতু পশ্চিম-ধারায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুখের উৎপত্তি, সুতরাং টলেমির ম্যাপ অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুখটি যথাক্রমে বর্তমান হুগলী নদীর মোহনা ও আদিগঙ্গা-মোহনা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর, যেহেতু পূর্বদিকের ধারাটির ছুটি মুখ, সুতরাং টলেমির ম্যাপ অনুযায়ী চতুর্থ মুখটি মধুমতী দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান হরিণঘাটার মোহনা এবং পঞ্চম মুখটি পদ্মা-বুড়ীগঙ্গা-মেঘনার সম্মিলিত মোহনা মুখ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আদিগঙ্গা সম্পর্কে নলিনীকান্তের মত হল যে, তুহাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গঙ্গানদী সম্পূর্ণ মজে গেলে রাজা ভগীরথ এই নদীপথের সংস্কার করায় দক্ষিণবঙ্গের কৃষিজীবীদের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। সম্পূর্ণ মজে যাক বা না যাক, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাচীনকালে একদা এই নদীমুখগুলির প্রত্যেকটির অস্তিত্ব বজায় ছিল। যেমন আদিগঙ্গা উপরাংশে মজে গেলেও, নিম্নাংশে গোবধিয়া, কালনাগিনী, ঘৃতবতী ও ধবলাটের-খালের মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে; স্বর্গত কালিদাস দত্ত আদিগঙ্গার এই গতিপথ সনাক্ত করেছেন। তেমনি ভাবে ক্যাম্বিসাম মুখটির নিম্নাংশের অস্তিত্ব এখনও আছে কি না তা সনাক্ত করতে এবং তার সম্পূর্ণ গতিপথ নির্ণয় করতে স্থানীয় গবেষকগণের অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন।

গঙ্গারিডি রাজ্য ও গঙ্গা বন্দর

গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণ পর্যালোচনা করেই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্বে পদ্মা-মেঘনার অন্তর্বর্তী স্থানে গঙ্গারিডিদের রাজ্য নির্দেশ করেছেন। এভাবে গঙ্গারিডিদের মূল ভূখণ্ড রাঢ়ের পরিবর্তে গাঙ্গোপদ্বীপরূপে, গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণ অনুযায়ী সঠিকরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। অবশ্য, টলেমির ম্যাপ অনুযায়ী রাঢ়ের একাংশ এই গঙ্গারিডিদের মধ্যে পড়ে। গঙ্গারিডিদের রাজ্য স্থাপনকালে দেশরূপে রাঢ়নামের ব্যবহার সুরু হয়নি, গঙ্গারিডি অঞ্চল তখন বঙ্গের পশ্চিমে পুণ্ড্র দক্ষিণাংশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাই তাম্রলিপ্তকে প্রাসীর অন্তর্ভুক্ত

বলেছেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই তথ্যকে গ্রহণ করে, তাকে 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' রূপে গণ্য করেছেন; কিন্তু মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী, প্রাসী ও গঙ্গারিডির মত তাম্রলিপ্তও (Talucate) একটি স্বতন্ত্র জাতি। সুতরাং নিশ্চয়ই তাদেরও জানপদ-স্বাতন্ত্র্য ছিল। গবেষণার প্রাথমিক স্তরের সিদ্ধান্তগুলি অনুসরণ করে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া সময়ের অপচয় মাত্র। তাম্রলিপ্তের প্রাচীনত্ব স্মরণ করে কেউ কেউ ভুলক্রমে তাম্রলিপ্তকে গঙ্গাবন্দর মনে করেছিলেন। 'পেরিপ্লাস মারিস ইরিথ্রিযাই' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থে অনুবাদক ডবলিউ. এইচ. স্কফও ভ্রমবশত মন্তব্য করেছিলেন যে, পূর্বভারতের সর্বপ্রাচীন গাঙ্গেয় সমুদ্রবন্দর তাম্রলিপ্তকেই পেরিপ্লাস-রচয়িতা মিশরবাসী গ্রীক নাবিক ভুলবশত গঙ্গাবন্দর নামে উল্লেখ করেছেন, কারণ উক্ত গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ নেই। স্কফ সাহেবের এই ভ্রান্ত মতানুসারে কেউ কেউ এবিষয়ে তাম্রলিপ্তপন্থী; তাঁরা এখনও তাম্রলিপ্তকে গঙ্গাবন্দর এবং প্রাচীন তাম্রলিপ্ত জাতিকেই 'গঙ্গারিডি জাতি' মনে করেন। উক্ত গ্রীকনাবিক যেখানে যেখানে যেভাবে পেঁৗছেছিলেন, সেখানকার কথা তাঁর দিনলিপিতে লিখে রেখেছিলেন। তাঁর বিবরণগুলি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, অক্ষরে অক্ষরে সত্য, কোনরূপ কল্পনাপ্রসূত অথবা শোনা কথা নয়। সুতরাং গঙ্গা-রিডিদের রাজধানী গঙ্গানগরের অস্তিত্ব ও বৈভবের কথাটিও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এবং এই গঙ্গানগর যে তাম্রলিপ্ত নয়, তার প্রমাণ প্রায়-সমসাময়িক কালে রচিত টলেমির নক্সা। তিনি পৃথক দুই স্থানে উক্ত দুটি নগরের উল্লেখ করেছেন, সে হিসাবে দুটি নগর এক নয় এবং তাম্রলিপ্তের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গঙ্গানগরের সঠিক অবস্থান বোঝায়।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে মহাপণ্ডিত হিপারকাস্ মানচিত্র অঙ্কণে সর্বপ্রথম অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ব্যবহার প্রবর্তন করেন। তিনিপৃথিবীর পরিধি ২৫,০০০ নটিক্যাল মাইলের পরিবর্তে ১৮,০০০ নটিক্যাল মাইল ধরেছিলেন, তাই নিরক্ষরেখার সঠিক অবস্থানের ২০০ নটিক্যাল মাইল উত্তরে তিনি নিরক্ষরেখা নির্দিষ্ট করেছিলেন। সেজন্য, আধুনিককালের গ্রীনউইচের পরিবর্তে তিনি দ্রাঘিমাংশের হিসাব সুরু করেছিলেন ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে, ফলে আধুনিক হিসাবের সঙ্গে সে হিসাবের গরমিল।

ভূগোলবিদ টলেমি হিপারকাসের প্রবর্তিত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর আট হাজার বিখ্যাত স্থানের অবস্থান-ক্ষেত্র নির্ণয় করেছিলেন। সেই স্থানগুলির মধ্যে 'তামালিটস' ও 'গঙ্গে' দুটি স্থানের আপেক্ষিক অবস্থানের দিকনির্ণয়ে টলেমির মত অসাধারণ পণ্ডিতের ভুল হতে পারে না। একই বন্দরকে দুই নামে দুটি পৃথক স্থানে নির্দেশ করাও অসম্ভব। ভূবিজ্ঞানসম্মত সঠিক হিসাব অনুসারে তাম্রলিপ্তের দক্ষিণ-পূর্বদিকে বর্তমান দক্ষিণ২৪পরগণা জেলাতেই গঙ্গে বন্দরের অবস্থান বিষয়ে অধিকাংশ গবেষক আজ একমত। যাঁরা দেগঙ্গা-পন্থী, অর্থাৎ সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে' লিখিত 'দেগঙ্গাই গঙ্গে বন্দর' এই মত সমর্থন করেন, তাম্রলিপ্তের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত উত্তর২৪পরগণার দেগঙ্গা টলেমির হিসাব অনুসারে তা প্রতিপন্ন করে না। প্রাচীন গঙ্গাবন্দরের অবস্থান বর্তমান দক্ষিণ২৪পরগণার দক্ষিণাংশে ছিল, টলেমির নির্দেশ অনুযায়ী সঠিক-ভাবে তা প্রতিপন্ন হয়; তবে গঙ্গাবন্দরের সমতুল্য 'দ্বিতীয় গঙ্গানগর' হিসাবে গঙ্গারিডি রাজ্যে 'দেগঙ্গা' (বা দ্বিগঙ্গা) একদা সহায়ক বন্দর হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল বোঝা যায়। অথবা, এমনও হতে পারে যে, মূল গঙ্গানগর ধ্বংসের ফলে দেগঙ্গায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। যেমন, বর্তমানকালে মূল গঙ্গানগর হিসাবে আমরা কলিকাতা নগরীকে ধরতে পারি; গঙ্গার নাব্যতা ও স্থানসংকুলান ইত্যাদির প্রয়োজনে বৃহত্তর কলিকাতা ছাড়াও ফলতা, হলদিয়া প্রভৃতি স্থানে সহায়ক-বন্দর হিসাবে গঙ্গাবন্দর সম্প্রসারিত হচ্ছে। তেমনভাবে, গঙ্গাসাগর তীর্থনগর মূল গঙ্গাবন্দর হিসাবে পরিগণিত হলেও, সমগ্র সাগরদ্বীপের ঘাটে ঘাটে অর্থাৎ মন্দিরতলা, ঘোড়ামারা প্রভৃতি নৌঘাঁটিসমূহে এবং পাকুড়তলা, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, আটঘরা, সপ্তগ্রাম, দেগঙ্গা প্রভৃতি স্থানে সহায়ক বন্দর গড়ে উঠেছিল। ধরতে গেলে সমগ্রভাবে এগুলি সম্প্রসারিত গঙ্গাবন্দর। সাগরদ্বীপের মন্দির-তলায় এবং ঘোড়ামারায় অতিপ্রাচীন বসতিস্তরের নিদর্শন সম্প্রতি পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎখননের দ্বারা এখানকার প্রাচীনত্বের সঠিক সময় নিরূপিত হতে পারে।

অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের ডায়েরী থেকে এবং টলেমির বিবরণ ও মানচিত্র থেকে আমরা গঙ্গাবন্দরের কথা জানতে পেরেছি। তাহলে তাঁদের নির্দেশিত স্থানেই আমাদের গঙ্গাবন্দরের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করতে হবে। স্থাননাম ও অবস্থানক্ষেত্র সম্পর্কে টলেমির ম্যাপে ভুল আছে বলে বাদ দিতে গেলে গঙ্গাবন্দরের অস্তিত্বকেও বাদ দিতে হয়। তাঁদের

উচ্চারণে স্থানের নাম বিকৃত হতে পারে, নির্দিষ্ট স্থানগুলির দূরত্ব কম-বেশী হতেই পারে (বর্তমানকালের মানচিত্রেও গ্রাম-গঞ্জ-নদী-খালের দূরত্ব সবক্ষেত্রে সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি); কিন্তু একটি বিশিষ্ট স্থান থেকে অপর বিশিষ্ট স্থানের আপেক্ষিক দিকনির্ণয়কে সঠিক ধরে নিতে হবে। টলেমির ম্যাপে পাটলিপুত্রের (Palimbothra Regia) দক্ষিণ-পূর্বদিকে তাম্রলিপ্তকে (Tamalites) দেখানো হয়েছে। এই দিকনির্ণয় ঠিকই আছে; কিন্তু পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী স্থানে তাম্রলিপ্তের অবস্থিতি দেখানো হয়েছে। অথচ আমরা জানি যে, বর্তমান তাম্রলিপ্ত (তমলুক) প্রকৃতপক্ষে যেখানে অবস্থিত, তা হওয়া উচিত যেখানে কংসাবতী (ক্যাম্বিসাম) ধারার গা থেকে সরস্বতী (ম্যাগনাম) ধারা বেরিয়ে এসেছে ঠিক তার কাছাকাছি দক্ষিণ-পশ্চিমে অর্থাৎ বর্তমান তমলুকের কাছেই। এক্ষেত্রে টলেমি ভুলক্রমে যেখানে তাম্রলিপ্তকে দেখিয়েছেন, আমরা তা কিছুতেই মেনে নিতে পারিনা। বর্তমান তমলুকের প্রকৃত অবস্থান অনুযায়ী আমরা ঐস্থান নির্ণয় করব। সে হিসাবে বর্তমান তমলুকের দক্ষিণ-পূর্বদিকে মোহনার নিকটবর্তী স্থানে গঙ্গাতীরে গঙ্গাবন্দরের অবস্থানকে মেনে নিতে হবে। রাজধানী-শহর (Regia) সমূহের প্রতি টলেমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন; Gange Regia-তে গঙ্গারিডিদের রাজা বাস করেন, একথাটিও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। উল্লেখযোগ্য স্থানের প্রকৃত অবস্থান জানা থাকলে, মানচিত্রের এই দূরত্বগত ভুল সংশোধন করে নেওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু তা না করে ম্যাপ দেখে তাম্রলিপ্তকে পাটনার কাছাকাছি ধরে নিয়ে বিচার করলে সে সমস্যার সমাধান কোনকালেই হবে না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুসরণে ম্যাক্রিণ্ডল তাঁর 'এ্যানসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাজ ডেসক্রাইব্‌ড্‌ বাই মেগাস্থেনিস এ্যাণ্ড আরিয়ান' গ্রন্থে 'প্রাচীন ভারতবর্ষের' একটি মানচিত্র উপস্থাপন করেছেন। সেখানে সপ্তগ্রাম বা পূর্বস্থলির অন্তঃপাতী 'গঙ্গে' বন্দর দেখানো হয়েছে। মেগাস্থিনিস ও প্লিনি গঙ্গারিদেস-কলিঙ্গীর রাজধানী হিসাবে যে পর্তেলিসের (Protalis) উল্লেখ করেছিলেন, ম্যাক্রিণ্ডল তাঁর এই ম্যাপে তার নিকটবর্তী স্থানে 'গঙ্গে' বন্দরকে দেখিয়েছেন; কিন্তু মেগাস্থিনিসের বিবরণে 'গঙ্গে' বন্দরের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই, গঙ্গারিদেস-কলিঙ্গীদের রাজধানীর উল্লেখ আছে।

গঙ্গারিডি : জাতি ও জনগোষ্ঠী এবং রাজ্য ও জনপদ

গঙ্গারিডি গবেষণার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, গঙ্গারিডির অবস্থানক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গবেষকগণ নামকরণের উৎস বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে নিরত হয়েছিলেন। মহীশূর

থেকে আগত কলিঙ্গবিজয়ী গঙ্গ-বংশীয় ব্রাহ্মণ ও রাঢ়ীদের সংমিশ্রণে 'গঙ্গারিডি-জনগোষ্ঠী' গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ আনুমানিক; প্রকৃতপক্ষে এই 'গঙ্গারাঢ়ী' আরেকটি পৃথক জাতি (Nation), এরা কোন জনগোষ্ঠী (Tribe) নয়। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদগণ ভাষাবিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় গ্রীকভাষাসূত্র অবলম্বনে গঙ্গারিডি নামের উৎস বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এই নামকরণের উৎস বিষয়টি আর বিতর্কিত নয়। গঙ্গারিডি-জনগোষ্ঠীর মূল অবস্থানক্ষেত্র সম্পর্কে গ্রীক ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তগুলি যে পরস্পব বিরোধী নয় তা প্রমাণিত হওয়ার পরেও আর কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু গঙ্গারিডি জাতি (Nation) ও জনগোষ্ঠীকে (Tribe) যদি এক মনে করা হয় এবং গঙ্গারিডিদের মূল ভূখণ্ড (জনপদ) বা রাজ্য (State) আর রাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যকে (Confedaration) যদি জড়িয়ে ফেলা হয়, তাহলে বিতর্কের অবসান কোনকালেই ঘটবে না। 'গঙ্গারিডি' নামকরণের মূলে ছিলেন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ। তাঁরা যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা মেনে নিয়ে, তাঁদের নির্দেশিত অঞ্চল, জনগোষ্ঠী ও জাতি সম্পর্কে তাঁদের অভিমতকে অবলম্বন করে প্রামাণ্য তথ্যসহ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করাই গঙ্গারিডি গবেষণায় প্রথম করণীয়। তারপর প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে এবং তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সামগ্রিক ইতিহাস রচনার কাজে হাত দিতে হবে। গবেষণা যে পর্যন্ত যথার্থ অগ্রসর হয়েছে, তার সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করে, আরো এগিয়ে যেতে হবে।

ম্যাক্রিণ্ডলের ম্যাপে GANGARIDAI যেভাবে দেখানো হয়েছে, তাতে এই 'দেশ' পদ্মা মেঘনা অতিক্রম করে পূর্বদিকে আরো কিছু অংশ অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গদেশ এবং পশ্চিমে ভাগীরথী অতিক্রম করে রাঢ়ের বিশাল এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই ম্যাপে মেগাস্থিনিস বর্ণিত তাম্রলিপ্ত (তালুকেট) জাতির এবং গঙ্গারিদেস কলিঙ্গীদের স্বতন্ত্র জনপদদুটির উল্লেখ নেই। এগুলিকে গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতি (Nation) হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই মানচিত্র সম্পর্কে "আলোচনায়" আগে বলা হয়েছে যে, এই দেশের মধ্যে "রাঢ়, তাম্রলিপ্ত তথা সুহ্ম ও কলিঙ্গের 'সমগ্র' অঞ্চল অবস্থিত" (২৪ পৃষ্ঠা, ৯ম পংক্তি); কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ মানচিত্রে রাঢ়, তাম্রলিপ্ত তথা সুহ্মের 'সমগ্র' অঞ্চল ও কলিঙ্গের 'অংশবিশেষ'কে দেখানো হয়েছে এবং কলিঙ্গকে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। অনবধানতাবশত কলিঙ্গের পাশে এই 'সমগ্র' শব্দটি ভুলক্রমে

বসানো হয়েছে, সেজন্য আমি দুঃখিত। মেগাস্থিনিসের উদ্ধৃতি থেকে প্লিনির বর্ণনা অনুযায়ী আমি প্রায় শ'খানেক জাতির নাম পেয়েছি। এক্ষেত্রে এইসব জাতি প্রকৃতপক্ষে এক-একটি জনগোষ্ঠীমাত্র—যুক্তরাজ্য গঠনের মাধ্যমে এদের মধ্য থেকে কোন কোন জনগোষ্ঠী ক্রমশঃ জাতি-গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিল। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহেও আমরা এমন অসংখ্য জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিচয় পাই। শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য স্থাপন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রভৃতি, শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে সংঘবদ্ধ করার প্রযাসমাত্র।

গ্রীক ও রোমান লেখকগণের বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গারিডি প্রথমতঃ একটা জনগোষ্ঠী (Tribe), তারপর তাদের প্রভাব বিস্তারের পরিপেক্ষিতে তারা একটি জাতি (Nation)। রাজ্যের প্রসার ঘটলেও গঙ্গারিডিদের মূল জনগোষ্ঠী গঙ্গার শেষাংশে মোহনাসমূহের মধ্যবর্তী বদ্বীপগুলিতে বসবাস করত এবং তাদের রাজা (দলপতি) বাস করতেন গঙ্গাবন্দরে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত গ্রীক বিবরণে ঐ একই কথা বর্ণিত হয়েছে। তাহলে, মোহনা অঞ্চলে যে প্রাচীন জনগোষ্ঠী অধিক-সংখ্যায় বসবাস করত, তারাই ছিল মূল গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠী। যে দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠীর অজেয় হস্তিবাহিনীর সংবাদে বিচলিত হয়ে আলেকজাণ্ডার বিপাশা পার না হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 'গঙ্গারিডি' ছিল 'কলিঙ্গী-প্রাসী গঙ্গারিডি' মিত্রশক্তির সদস্যরাজ্য। আলেকজাণ্ডার মগধ আক্রমণ করলে প্রতিরক্ষার প্রযোজনে এরা সকলেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। সবদিক বিবেচনা করেই বিচক্ষণ আলেকজাণ্ডার মগধ আক্রমণের ঝুঁকি নিতে চাননি। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থান রোধ করার উদ্দেশ্যে দূরদর্শী মহারাজ ধননন্দ এই যুক্তসাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই তিনি গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণে প্রাচ্য-গঙ্গারাষ্ট্রের অধীশ্বররূপে অভিহিত হয়েছেন।

আলেকজাণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রধান কারণ

আলেকজাণ্ডারের স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের কারণ সম্পর্কে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বহু গবেষক বহু কারণ নির্ধারণ করেছেন। তার মধ্যে সুপ্রশস্ত গঙ্গানদী অতিক্রমের বাধা, রণক্লান্ত সৈনিকদের যুদ্ধে অনীহা এবং সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণগুলি অমূলক না হতেও পারে। একটি ঘটনা একাধিক কারণে সংঘটিত হতেই পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে, প্রায় সমসাময়িককালের গ্রীক লেখকদের প্রতিবেদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে

হবে। স্বয়ং মেগাস্থিনিসের বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে, ডিওডোরাস গঙ্গারিডিদের পরাক্রান্ত হস্তীবাহিনীর সংবাদকে আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের বিশেষ কারণ হিসাবে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সে কথা আগেই বলেছি (২৬-২৭ পৃষ্ঠা)। তাঁর মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, গঙ্গার অববাহিকায় গঙ্গারিডিরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তাদের হস্তীবলের ভয়ে আলেকজাণ্ডার ফিরে যান। বিপাশা থেকে আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে তিনি আরো লিখেছেন যে, আলেকজাণ্ডার ফিজিয়াস (Phegeus) নামক ভারতের একজন দেশীয় নৃপতির বর্ণনা থেকে সিন্ধুপারের দেশের খবর পেয়েছিলেন (সম্ভবত, এই সংবাদ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত আলেকজাণ্ডারের গুপ্তচরগণের মধ্যে ইনি ছিলেন বিশেষ একজন)। প্রথমে ইনি একটি মরুভূমিতে পৌঁছেছিলেন, যা অতিক্রম করতে বারোদিন সময় লেগেছিল। এর পরেই ভারতবর্ষের নদীসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর এবং বত্রিশ স্টাডিয়া প্রশস্ত 'গঙ্গা' নামক নদী। এর পারে প্রাসী ও গঙ্গারিডিদের রাজ্য অবস্থিত, যার অধিনায়ক জান্দ্রামেসের কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দুলক্ষ পদাতিক, দুহাজার রথ এবং চার হাজার সুশিক্ষিত রণহস্তী যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত আছে। এই সমাচারের যথার্থতা সম্পর্কে মিত্র 'পুরু'-রাজের স্বীকৃতি থেকে আলেকজাণ্ডার এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন। আলেকজাণ্ডারের স্বপক্ষীয় গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিস এবং তাঁর স্বদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডিওডোরাস তদানীন্তনকালের পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে যে সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষভাবে করেছিলেন, তা কোনক্রমেই অমূলক হতে পারে না। পরন্তু ঐতিহাসিক পারম্পর্য-বশতঃ এই বিশেষ কারণটিকে 'প্রধান কারণ' হিসাবে গণ্য করা উচিত।

এই 'পর্যালোচনা' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন পাঠকগণের ধৈর্যচ্যুতির কারণ হতে পারে, একথা অনুমান করেও ২২-২৩ এবং ২৬-২৭ পৃষ্ঠার আলোচনা থেকে অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের বিবরণগুলি প্রাসঙ্গিক কারণেই এখানে পুনরুল্লেখ করছি। আলেকজাণ্ডারের জীবনীলেখক কুইন্টাস কার্টিয়াস রুফাস তাঁর 'লাইফ অব আলেকজাণ্ডার গ্রন্থে লিখেছেন যে, বিপাশার নিকট পৌঁছানোর পর আলেকজাণ্ডার ফিজিয়াস নামক একজন দেশীয় নৃপতির নিকট সম্মুখের দেশটির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, বিপাশা নদীর ওপারে একটা অতি বিশাল মরুভূমি অবস্থিত, যা অতিক্রম করতে প্রায় এগারো দিন সময় লেগেছিল। তার পরেই গঙ্গানদী, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশাল নদী, যার অপর

তীরে গঙ্গারিডি (Gangaridae) ও প্রাসী (Pharrasii) নামক দুটি জাতির (Two nations) বসবাস, যাদের রাজা এ্যাগ্রামেস (Agrammes) স্বদেশের প্রতিরক্ষায় মজুত রেখেছেন কুড়ি হাজার অশ্বারোহী ও দুলক্ষ পদাতিক ; আরও, দুহাজার চার-ঘোড়ার রথ এবং সমগ্র বাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তিন হাজার হস্তীর একটি ফৌজ। এই বিবরণেও হস্তীবাহিনীকে ভয়ঙ্কর বলা হয়েছে।

বিপাশা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলের মনোভাব প্রসঙ্গে গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক লিখেছেন যে, পুরুকে পরাস্ত করতেই তাদের যে নিরতিশয় বিঘ্ন ঘটেছিল, তাতে তারা মাত্র কুড়ি হাজার পদাতিক ও দুহাজার অশ্বারোহী সম্বল করে, গঙ্গা অতিক্রমের জন্য আলেকজাণ্ডারের জেদের দৃঢ় বিরোধিতা করেছিল। তাছাড়া তারা শুনেছিল যে, এই নদী বত্রিশ স্টাডিয়া প্রশস্ত এবং একশ ফ্যাদম গভীর, যখন এর অপর তীর সৈনিক, অশ্ব ও হস্তীতে ছেয়ে আছে। গঙ্গারিডি (Gangaridae) এবং প্রাসীর (Prasioi) রাজাদের নির্দেশে আশী হাজার অশ্ব, দুলক্ষ পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধরথ এবং ছহাজার রণহস্তী নিয়ে একটি বিশাল বাহিনী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি বলেছেন যে, প্রাসীর রাজার অধীনে বেতনভুক ছলক্ষ পদাতিক ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং ন হাজার গজারোহী সৈন্য ছিল। এসব তথ্য আমরা F. J. Monahan-কৃত The Early History of Bengal গ্রন্থ থেকে সবিশেষ জানতে পারি।

গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণে গঙ্গার আয়তন এবং গভীরতা বিষয়ে এবং সৈন্যাদির সংখ্যা বিষয়ে তারতম্য থাকলেও, আলেকজাণ্ডারের প্রতিরোধে মগধ সাম্রাজ্য গঙ্গারিডিদের সহযোগে যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়, এদের সম্মুখীন হলে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে অবশ্যই পরাজয় বরণ করতে হত এবং তাহলে ইতিহাসও অন্যভাবে লিখিত হত। যাহোক, শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষে মগধের সঙ্গে গঙ্গারিডিদের যৌথ-প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ বাঙালীর ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রণহস্তীসমৃদ্ধ গাঙ্গেয়-বাঙালী জাতির সামরিক শক্তির সংবাদ দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের ত্রাস উৎপাদন করতে পেরেছিল, গ্রীক ঐতিহাসিকের এই মন্তব্য সমগ্র বাঙালী জাতির কাছে বিশেষ গর্বের বিষয়।

সাগরদ্বীপ ও গঙ্গাসাগর কত প্রাচীন ?

সমুদ্র এক সময হিমালযের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সে অঞ্চলে প্রাপ্ত সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষের ফসিল থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায না। তেমন, সমগ্র বঙ্গদেশ একদা জলের তলায থাকলেও এখানকার ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব কম নয। একইভাবে, দক্ষিণ২৪পরগণা ও সুন্দরবনসহ সমগ্র উপবঙ্গ ভৌগোলিক বিচাবে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হলেও, ইতিহাসের বিচারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা প্রাচীন হতে বাধা নেই। এখন আমাদের দেখতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে বর্তমান নিম্নবঙ্গ কত প্রাচীন। সেজন্য আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদির বিববণ এবং মাটির তলায প্রাপ্ত বসতিস্তব ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির উপর নিভর কবতে হবে। রামাযণ, মহাভারত, পুবাণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণেব সঙ্গে, প্রাচীন বসতিস্তবে আবিষ্কৃত প্রত্নসম্পদগুলির বযস মিলিযে নিতে হবে। প্রাচীনকালে গঙ্গাসাগরসঙ্গম কতদূব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ বিষযে আমাদের অনেকের অনেক প্রশ্ন। ঐতিহাসিকগণের বিচাবে, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশ অপেক্ষা পূববঙ্গের (হবিণঘাটাব পূর্বপারের) দক্ষিণ অংশ অবাচীন। তথাপি এই অংশে 'সন্দীপেব' প্রাচীনত্ব বিষযে ঐতিহাসিকগণ অনেকেই অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেছেন। আব, ভাগীরথী-জাহ্নবীর সাগর-সঙ্গমস্থলের প্রাচীনত্বেব বিষয বামাযণ থেকে শুরু করে বহু শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত হযেছে। সেই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে কপিলমুনির আশ্রম প্রকৃতপক্ষে কোথায ছিল, এসম্পর্কেও আমাদেব অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে। বর্তমানে যেখানে কপিলমুনির মন্দির, তার দক্ষিণে আরো অনেক দূরে ছিল প্রাচীন মন্দির। কূল ভেঙে সমুদ্র যত এদিকে এগিযে আসছে, কপিলমুনির মন্দিরও তত সরতে সরতে বর্তমান স্থান পর্যন্ত পিছিযে এসেছে। মধ্যযুগীয কাব্যসমূহে এবং অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনায এর দক্ষিণে অনেকদূর পর্যন্ত স্থানের অস্তিত্বের পরিচয মেলে।

ঐতিহাসিক কালে প্রতিষ্ঠিত কপিলমুনির প্রচীন (প্রথম) মন্দির যেখানে ছিল, সে স্থান নিশ্চযই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হযেছে। নাহলে, উক্ত মন্দির যদি আরো উত্তরে উচ্চভূমির কোন অংশে স্থাপিত হত, তাহলে সেস্থান আজও চিহ্নিত হয়ে তার ঐতিহ্য বজায় রাখত। আদিগঙ্গা মজে গেলেও, ভগীরথের স্মৃতি-বিজড়িত নদী-বাটেঘাটে স্নানক্ষেত্র ও শ্মশান ঘাটগুলির স্থানমাহাত্ম্য অনুসরণে এদেশের মানুষ আজও তা

নিষ্ঠার সঙ্গে চিহ্নিত করে রেখেছে। গঙ্গার বর্তমান পরিবর্তিত গতি-পথে অর্থাৎ হুগলীনদীর ঘাটে ঘাটে বা সঙ্গমস্থলে উক্ত তীর্থক্ষেত্রগুলিকে স্থানান্তরিত করা হয়নি। সে হিসাবে, ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীন গঙ্গাসাগরসঙ্গম তীর্থক্ষেত্র আরো দক্ষিণে ছিল, এ কথা অনস্বীকার্য। মহাভারতের বর্ণনায় পুণ্ড্র ও বঙ্গের দক্ষিণে লৌহিত্য দেশ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরকূলের যে বর্ণনা আমরা পেয়েছি, তা যে উক্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা বিশ্বাস করার কারণ আছে। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী দেউলপোতা এবং কুল্পীর নিকটবর্তী হরিনারায়ণপুরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বসতিস্তরের যে নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত মহাশয় আবিষ্কার করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব আধিকারিক স্বর্গত পরেশ-চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় উৎখননের মাধ্যমে দেউলপোতায় উক্ত বসতিস্তরের অস্তিত্ব সরকারীভাবে প্রমাণ করেছেন। সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা থেকেও যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তাতে সেখানে উৎখনন চালালে আরো বিস্ময়কর তথ্য উন্মোচিত হবে।

মন্দিরতলা থেকে যে সব মূল্যবান নিদর্শন প্রত্নসম্পদ-ব্যবসায়ীদের হাতে অবাধে চলে যাচ্ছে রাজ্যসরকার যদি অবিলম্বে সেখানে সংরক্ষণ ও উৎখননের কাজ আরম্ভ না করেন, তাহলে ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অনেক মূল্যবান সাক্ষ্য হেলায় হারাতে হবে। এই মন্দিরতলা, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা প্রভৃতি এলাকাকে সাগরদ্বীপ অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে ধরতে পারি, রামায়ণে যে এলাকাকে রসাতল বা পাতাল বলা হয়েছে। এই এলাকার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বসতিস্তরের সাক্ষ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, গ্রীক ঐতিহাসিকদের বর্ণনাকাল পর্যন্ত এখানে মনুষ্যবসতি ছিল। তার আগে থেকেই এখানে সাগর-দ্বীপের অস্তিত্ব ছিল এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম তীর্থনগর যে এ অঞ্চলেই ছিল, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, মহারাজ সগর কর্তৃক অধিকৃত এই দ্বীপ প্রথমে "সগরদ্বীপ" নামে অভিহিত হয়েছিল, বর্তমানে যে দ্বীপটি আমাদের কাছে "সাগরদ্বীপ" রূপে পরিচিত। সাগরদ্বীপে মন্দিরতলায় প্রাচীন বসতিস্তরের মধ্যে থেকে প্রাপ্ত প্রাকমৌর্য যুগের নিদর্শন থেকে গঙ্গাঋদ্ধি সভ্যতার পরিচয় মেলে। মন্দিরতলায় প্রাপ্ত একটি ফ্লিণ্ট পাথরের ক্ষুদ্র হাতিয়ারের ছিদ্রমধ্যে এক-টুকরো প্রবাল এ অঞ্চলে প্রবালদ্বীপের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদানে সাহায্য করে এবং প্রাগৈতিহাসিক বসতিস্তরের অস্তিত্বের ইঙ্গিত প্রদান করে।

বাংলার কৈবর্ত সম্প্রদায়, রাঢ়দেশ ও গঙ্গারিডি জাতি

প্লিনি তাঁর 'হিস্টরিয়া ন্যাচারালিস্' গ্রন্থে একশত ভারতীয় জনগোষ্ঠীর (Race or Tribe) নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের বাসস্থান সম্পর্কেও তিনি যথাসম্ভব নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বনে গবেষকগণ নিজ নিজ সাধ্যমত সেইসব জনগোষ্ঠী, জনপদ, পাহাড় ও নদনদীর দুর্বোধ্য নামগুলি সনাক্তকরণের চেষ্টা করেছেন, এগুলি যে অবাস্তব নয়, তাও এভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

'কলিঙ্গী' ও তাদের তিনটি শাখা 'মকোকলিঙ্গী', 'গঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গী', 'মোদগলিঙ্গী' এবং তালুক্টে (Taluctae) বা 'তালুক্তি' অর্থাৎ তাম্রলিপ্তি—এই পাঁচটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কৈবর্ত ও মাহিষ্যগণের সম্পর্ক আছে [ভুলক্রমে এই পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় Taluctae-স্থলে Talucate এবং ৪৩ পৃষ্ঠায় তালুক্টে-স্থলে তালুকেট ছাপা হয়েছে বলে আমি দুঃখিত]। কলিঙ্গীদের একটি শাখা মহাভারতবর্ণিত 'কর্বট' রাজ্যে অর্থাৎ কেবর্ত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং 'কৈবর্ত' নামে অভিহিত হয়। কৈবর্তদের একটি শাখা কৃষিজীবী এবং অপর শাখা মৎস্যজীবী ও নৌজীবী। কৃষিজীবী অর্থাৎ চাষীকৈবর্তরা নিজদিগকে পুরাণবর্ণিত চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির বংশধর 'মহিষ্মানের' উত্তরপুরুষ হিসাবে দাবী করে। তাদের মতে, মাহিষ্যগণের আদিনিবাস ছিল উত্তরভারতের সরযূ বা গোগ্রী উপত্যকা অঞ্চলে (See, District Census Report, Midnapore—1891, P-4), সেখান থেকে দক্ষিণে নর্মদা উপত্যকায় রাজা মহিষ্মান কর্তৃক মাহিষ্মতী নগরী ও মাহিষক রাজ্য স্থাপিত হয় (হরিবংশ, ১ম খণ্ড, ৩০ অধ্যায় এবং পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৭৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। গবেষক সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের মতে, তারা নর্মদা ও সরযূ তট থেকে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্তে এসে বাস করে ("মাহিষ্য"—দৈনিক বসুমতী. ১ আষাঢ়—১৩৬০)। কলিঙ্গ সাম্রাজ্য একদা বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল, সে হিসাবে কলিঙ্গী, তাম্রলিপ্ত, কিবর্ত, কবট ও কৈবর্ত একই কলিঙ্গী জাতির বিভিন্ন নাম, অর্থাৎ এরা সবাই কলিঙ্গী। এই মহিষ্মান-বংশীয় কলিঙ্গীদের যে শাখা হিমালয় সন্নিহিত উত্তরভারতের পূর্বোক্ত অঞ্চলে বাস করত, প্লিনি তাদেরকেই বলেছেন 'মক্কোকলিঙ্গী' অর্থাৎ মাহিষক-কলিঙ্গী। এই কলিঙ্গ বা কর্বট অর্থাৎ কেবর্ত দেশ থেকে এরা বাণিজ্য উপলক্ষে সাগর পাড়ি দিয়ে যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেখানে এরা মাহিষ-ক'বো (Mahis-K' Bo) নামে অভিহিত।

কর্বট রাজ্য ছিল সম্ভবত তাম্রলিপ্তের উত্তরে রাঢ় অঞ্চলেই ; এখানে গঙ্গারিডি ও কলিঙ্গীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল 'গঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গ'

নামক পৃথক রাজ্য সে কথা আগেই আলোচিত হয়েছে (পৃঃ ২৪)। আর তাম্রলিপ্তের দক্ষিণ-পশ্চিমে, কংসাবতী মোহনার সংলগ্ন প্রকাণ্ড দ্বীপে যারা বাস করত, প্লিনি তাদের বলেছেন 'মোদগলিঙ্গী' অর্থাৎ মধ্যকলিঙ্গী। কলিঙ্গ ও গাঙ্গেয়-কলিঙ্গের মধ্যবর্তী এই দ্বীপ তখন আসল কলিঙ্গ রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং একদা উৎকলেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল, সুতরাং মধ্য-কলিঙ্গীরা ছিল আসল-কলিঙ্গী. সমুদ্রকূলের এই গাঙ্গেয় দ্বীপবাসীদের অধিকাংশ নৌজীবী ও মৎস্যজীবী হওয়াই স্বাভাবিক। প্লিনি বলেছেন. এখানে 'মোদগলিঙ্গী' নামক একটি মাত্র জনগোষ্ঠীর বাস ছিল. সম্ভবত এই দ্বীপ মৎস্যজীবী-কৈবর্ত বা আদি-কৈবর্তদের আদিনিবাস ছিল। 'মৎস্যজীবী-কলিঙ্গী' অর্থাৎ 'মৎস্য' ও 'কলিঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'মোদগলিঙ্গী' শব্দটির বিশেষ সম্পর্ক থাকতে পারে, যেমন 'মাহিমক-কলিঙ্গীদের' সঙ্গে মক্কোকলিঙ্গী' শব্দটির সাদৃশ্য আছে। টলেমির 'ক্যাম্বিসাম্' বা ক সাবতী মোহনার পশ্চিমে গাঙ্গেয়-দ্বীপের অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ আছে। প্রাচীন সরস্বতী অর্থাৎ কংসাবতী-সংলগ্ন গঙ্গাখাতের গা থেকে আরেকটি ধারা তাম্রলিপ্তের দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে ও পশ্চিম-দক্ষিণে বর্তমান পিংলা, খড়্গপুর, নারায়ণগড় ও দাঁ·নের পথ ধরে সাগরে পড়ত, অর্থাৎ. মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে প্রায় সমগ্র কাঁথি মহকুমা ও সন্নিহিত অঞ্চল জুড়ে বৃহৎ গাঙ্গেয়-দ্বীপটিই 'মধ্যকলিঙ্গ' নামে অভিহিত হয়েছিল। সলিনাসের মতে, এই গাঙ্গেয় দ্বীপটি ছিল বহু জনাকীর্ণ এবং এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি এখানে বাস করত। স্থানীয় গবেষক শ্রীজগদীশ চক্রবর্তীর একটি রচনায় এর সাক্ষ্য মেলে—"অপর মোহনামুখটি পিংলাকে দক্ষিণে ও পূর্বে রেখে, খড়্গপুর, নারায়ণগড় ও দাঁতনের পূর্বাংশ দিয়ে প্রবাহিত··· সংক্ষেপে ডেবরা থানার পূর্বে ও দক্ষিণে বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলের মত একটি দ্বীপময় ভূ-ভাগের ইঙ্গিত মিলছে। ··ব্যারোসের সমসাময়িক শ্রীচৈতন্যদেব ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে আদিগঙ্গা বা গঙ্গার তৃতীয় পর্যায়ের পথে ছত্রভোগ, বারুইপুরের পর জলপথে নারায়ণগড়ে আসেন। বৃন্দাবন দাসের কথায় ও কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃতের' বর্ণনা অনুসারে নারায়ণগড়ের কাছে 'গঙ্গাঘাটের' অস্তিত্ব ছিলই। এটিই ব্যারোসের ম্যাপেরও বক্তব্য" ('গঙ্গারিডি : দেশ ও জাতি'—বিবেকানন্দ দাশ, 'সূর্যদেশ' আষাঢ়-১৩৯১, পৃঃ ৪—৫ দ্রষ্টব্য)।

'ক্যাম্বিসাম্' অর্থাৎ ক সাবতী-মোহনা টলেমির মানচিত্র অনুযায়ী গঙ্গারিডি রাজ্যের পশ্চিমসীমা। এছাড়া একদা সরস্বতী নদী ত্রিবেণী ও

সপ্তগ্রাম থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সাঁকরাইলের পূর্বদিক থেকে দক্ষিণে বর্তমান হুগলী-নদীপথে সাগরে পড়ত। প্রাচীনকাল থেকে গঙ্গার এই মুখটি বৃহৎ, তাই টলেমি এই মুখটির নাম দিয়েছেন 'ম্যাগনাম্।' সপ্তগ্রামের দক্ষিণে সরস্বতীর গা থেকে আরেকটি ধারা (অর্থাৎ 'প্রাচীন-সরস্বতী') দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে, কোলাঘাট ও তাম্রলিপ্তকে পশ্চিমে রেখে, দক্ষিণদিকে নেমে, 'কংসাবতী-হলদী' নদীপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাগরে পড়ত—এই ধারাকেই টলেমি বলেছেন 'ক্যাম্বিসাম্' অর্থাৎ কংসাবতী-ধারা, যে ধারাটি একদা রাজমহলের পথ ধরে নেমে এসেছিল। মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় এর নাম 'কপিশা', তিনি লিখেছেন যে, দিগ্বিজয়ী রঘু নৌযুদ্ধে উদ্যত বঙ্গদিগকে সবলে উৎখাত করে, গঙ্গাস্রোতের ফাঁকে ফাঁকে (অর্থাৎ নিম্নগাঙ্গেয় ব-দ্বীপসমূহে) জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন এবং হস্তীসেতু রচনা করে সসৈন্যে কপিশা পার হয়ে, উৎকলের দিকের পথ ধরে কলিঙ্গ অভিমুখে গেলেন। কপিশা পার হয়ে কলিঙ্গ অভিমুখে এই উৎকলের দিকের পথেই প্লিনির 'মধ্যকলিঙ্গ', উপসাগরকূলে এটিই সেই 'গঙ্গার একটি বৃহৎ দ্বীপ।' 'সূর্যদেশ' পত্রিকায় পূর্বোক্ত রচনাটি থেকে কংসাবতী-মোহনা সম্পর্কে জানা যায়—"বর্তমান কাঁসাইয়ের নিম্নতম গতি ও ক্ষীরাই-চণ্ডা-হলদী নদীবিধৃত পথটিই সেই ঐতিহাসিক জলপথের স্মারক। বর্তমান হলদিয়া বন্দর কংসাবতী তীরের তাম্রলিপ্তের ঐতিহাসিক জলপথের উপরেই অবস্থিত। এই জলপথটি দিয়েই পরিব্রাজক ঈৎ-সিঙের অর্ণবপোত তাম্রলিপ্ত, ব্রহ্মদেশ ও চীনের পথে যাতায়াত করেছিল।"

আদিকৈবর্ত আসল-কলিঙ্গী, আর মাহিষক-কলিঙ্গী এ অঞ্চলে বহিরাগত। গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ (কর্বট), তাম্রলিপ্ত ও মধ্যকলিঙ্গ (প্রায় সমগ্র কাঁথি মহকুমা ও সন্নিহিত অঞ্চল) এই তিনটি জনপদ কখনও ছিল কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের অধিকারে, কখনও বা সুহ্মদেশের অন্তর্গত, আবার কখনও বঙ্গদেশের অধিকারভুক্ত, আবার এই সমগ্র অঞ্চল কখনও মগধসাম্রাজ্য অর্থাৎ প্রাসীর অন্তর্ভুক্ত এবং কখনও বা গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল—একথা আগে আলোচিত হয়েছে। মেগাস্থিনিস ও প্লিনির বর্ণনানুসারে কলিঙ্গীদের ছিল তিনটি শাখা—মধ্যকলিঙ্গী, গাঙ্গেয়-কলিঙ্গী ও মাহিষক-কলিঙ্গী—এই মতের যথার্থ্যতা সম্পর্কে আমরা পূর্বসূরী গবেষকগণের সঙ্গে একমত; এই সবিশেষ আলোচনায় সেই অভিমতই সমর্থিত হল। কে+বৃৎ+অন্=কেবর্ত (দেশবাচক) এবং তা থেকে কৈবর্ত (জাতিবাচক) শব্দের উদ্ভব। কে=জল, বৃৎ=আবৃত অথবা ব্রতী বা নিযুক্ত; সুতরাং 'কেবর্ত' শব্দের অর্থ—'যে-স্থান জলাবৃত', আর 'কৈবর্ত' শব্দের অর্থ—'যারা

জলে নিযুক্ত থাকে'। নৌজীবী ও মৎস্যজীবী-কৈবর্তরা অতি প্রাচীনকাল থেকে নিজেদের বৃত্তি অবলম্বনে সারা দেশে রাজ্যে-রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং উক্ত বৃত্তির জন্যই ধীবর বা দাশ নামে অভিহিত হয়েছিল। পূর্বকালে 'কৈবর্ত' নাম বা উপাধি নিন্দনীয় ছিলনা—নৌ সেনাপতি অর্থে গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে বলা হযেছে "কৈবর্তক: কেশব:", মহাপদ্মনন্দ বা উগ্রসেনের সপ্তম পুত্রের নাম ছিল "কৈবর্ত"; উগ্রসেনের অষ্টম পুত্র অর্থাৎ কৈবর্তের ভ্রাতা "ধন" বা ধননন্দ ছিলেন প্রাসী-গঙ্গারিডি যুক্তসাম্রাজ্যের অধিনায়ক, তিনি ঔগ্রসেন (এ্যাগ্রাম্মেস্) নামে বর্ণিত হযেছেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশে একদা মাহিষ্য নামের প্রচলন ছিলনা, কেবলমাত্র কৈবর্ত নামই প্রচলিত ছিল; কৈবর্ত-জাতি বিশেষ ঐতিহ্যের অধিকারী—দাশরাজের পালিতা কন্যা সত্যবতী বা মৎস্যগন্ধার গর্ভে 'মহাভারতে'র বেদব্যাস, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম হয়েছিল। পরশুরাম কৈবর্তাধ্যুষিত দেশে কৈবর্তদিগকে যজ্ঞসূত্র দান করে বিপ্র করে নিয়েছিলেন। কৈবর্তরাজ দিব্যোক, ভীম, বীর মোহনলাল, রাণী রাসমণি, মাতঙ্গিনী হাজরা, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখের অবদানে সারা দেশ এবং কৈবর্তদের অবিভক্ত জনগোষ্ঠী বিশেষ গৌরবান্বিত। উৎপত্তির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের জন্য অন্যান্য প্রত্যেক জাতিই গৌরবের অধিকারী, কিন্তু শাস্ত্র-পুরাণে উল্লিখিত জাতিসমূহের জন্ম-বৃত্তান্ত বা বর্ণসংকর-বিভাজন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, বিভ্রান্তিকর ও অবাস্তব। সাধারণত রাজবংশ, দেশনাম, গোষ্ঠীনাম ও বৃত্তিনাম থেকে বিভিন্ন জাতিনামের উৎপত্তির বিবরণই ইতিহাস-বিজ্ঞানসম্মত।

রাজবংশীগণের মত কৈবর্তগণের মধ্যে একদল ছিল মৎস্যজীবী, আর একদল ছিল কৃষিজীবী। ব্রাহ্মণ্য-বর্ণবৈষম্যের ফলে কালক্রমে জালিকবৃত্তি ও কৈবর্ত-নাম সমাজে নিন্দনীয় হতে থাকে। তখন থেকে বাংলার কৃষিজীবী-কৈবর্তগণ নিজদিগকে চাষীকৈবর্ত বা চাষীদাস, হেলে-কৈবর্ত বা হালিক দাস, হালিফ দাস, পরাশর দাস ও মাহিষ্য প্রভৃতি পরিচয় দিতে থাকে। জেলে কৈবর্তরাও ১৯১১ সালের লোকগণনায় 'রাজবংশী' এবং ১৯২১ সালের লোকগণনায় 'মাহিষ্য', 'রাজবংশী' ও 'আদিকৈবর্ত' নাম দাবী করেছিল বলে সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়। জেলেকৈবর্তরা অনেকে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়ে, জালিকবৃত্তি ত্যাগ ক'রে ও কৃষিবৃত্তি গ্রহণ ক'রে চাষীকৈবর্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে; ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে জেলেকৈবর্তের সংখ্যা ছিল ৩,৮৪,০৪৯, কিন্তু ১৯৩১ সালে তা কমে গিয়ে হয় ৩,৫২,০৭২। দশবছরে জনসংখ্যা বেড়ে না গিয়ে অত কমে যাওয়ার কারণ ঐ একটাই। ইতিমধ্যে ১৯২১

সালের সেন্সাস রিপোর্টে চাষীকৈবর্তের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'মাহিষ্য' নামটি সরকারীভাবে প্রথম গৃহীত হয় এবং জেলেকৈবর্তের নামের পাশে 'আদিকৈবর্ত' নামটিও একইভাবে লিখিত হয়। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে 'চাষীকৈবর্ত (মাহিষ্য)' ও 'জেলেকৈবর্ত (আদিকৈবর্ত)' দুটি নামই 'অবনত শ্রেণীসমূহের' (Depressed Classes) তালিকায় ছিল। অতঃপর বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক ১৬।১।১৯৩৩ তারিখে প্রকাশিত ১২২ A.R. নম্বর মন্তব্যে উক্ত ডিপ্রেস্ড্-শ্রেণীর তালিকান্তর্গত সম্প্রদায়গুলিকে নিয়ে Scheduled Castes বা তপশীলভুক্ত জাতি এবং Scheduled Tribes বা তপশীলভুক্ত উপজাতিদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সরকারী ভাষ্য-মতে—"জাতিসমূহের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতার বিষয়কে ভিত্তি করে এবং তাদের স্বার্থরক্ষার্থে তাদের বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার দেবার আবশ্যকতা বিবেচনা করে ঐ তালিকা প্রস্তুত হয়" (বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টের ৯১৫ A.R. নম্বর, ২৮।১২।১৯৩৪ তারিখের ইস্তাহার দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে, "যে জাতি ডিপ্রেস্ড্ শ্রেণী থেকে বার হতে চায়, তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না"—সেন্সাস রিপোর্টে এরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ থাকায় 'চাষীকৈবর্ত (মাহিষ্য)' শ্রেণী সরকারের নিকট আবেদনক্রমে ১৯৩১ সালের লোকগণনায় ডিপ্রেসড্-শ্রেণীর তালিকা থেকে বাদ যায়, কিন্তু জেলেকৈবর্তদের অধিকাংশ স্বেচ্ছায় ঐ তালিকাতেই থাকে এবং তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে কৈবর্ত বা কলিঙ্গী জাতির দুটি শাখার ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ডিপ্রেস্ড্-শ্রেণীভুক্ত থাকার পর কাপালী, নাথ, রাজু, সাহা ও সূত্রধর জাতি ঐ তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায়, তপশীলীভুক্ত জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। দুলে বা দলুই-ক্ষত্রিয় জাতির নাম ডিপ্রেস্ড্-শ্রেণীর তালিকায় ছিল না, এবং 'বাগ্‌দী' জাতির শাখা হিসাবে তপশীলভুক্ত হয়েছে। রাজবংশী জাতি একবার তপশীল থেকে বার হয়ে আবার তপশীলভুক্ত হয়েছে। পুণ্ড্রীগণও একবার তপশীল থেকে বার হয়ে, পৌণ্ড্রজাতির শাখারূপে আবার তপশীলভুক্ত হয়েছে। এবং 'পলীয়' অর্থাৎ 'পৌণ্ড্রীয়'গণ নিজদিগকে পৌণ্ড্রদেশের ক্ষত্রিয়জাতি হিসাবে দাবী করলেও সরকারী তালিকায় পৌণ্ড্রজাতির শাখারূপে গণ্য না হয়ে পৃথকভাবে তপশীলভুক্ত হয়ে আছে। আবার এমনও দেখা যায় যে, এক প্রদেশের বর্ণহিন্দু অন্যপ্রদেশে তপশীলভুক্ত জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন, বিহারে রাজবংশীরা বর্ণহিন্দু, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তারা তপশীলী জাতি। বিহারে ও উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা মৎস্যজীবী নয়, দক্ষিণবঙ্গে

তারা মৎস্যজীবী ; কিন্তু সেজন্য তাদের মধ্যে শ্রেণীভেদের দাবী ওঠেনি। ১৯১১ ও ১৯২১ সালের লোকগণনায় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী ক'রে তারা ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে "রাজবংশী (ক্ষত্রিয)" হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারপর সম্ভবত তপশীলভুক্ত হওয়ার জন্য তাদের "ক্ষত্রিয়" অভিধা সরকারী কাগজপত্রে আর ব্যবহৃত না হলেও, ১৯২১ সালের উক্ত স্বীকৃতিকে তো আর অস্বীকার করা যাবেনা? যাহোক, 'অবনত শ্রেণী' থেকে বাদ গিয়ে যারা অতপশীলী-হিন্দু অর্থাৎ 'বর্ণ হিন্দু,' আর অবনতশ্রেণী থেকে বাদ না-গিযে যারা 'তপশীলী জাতি', ঐ একটি উৎসগত কারণেই তারা কিন্তু স্বগোত্রীয। সে হিসাবে আদিকৈবর্তরা তপশীলী এবং চাষীকৈবর্তরা বর্ণহিন্দু হলেও, তাদের যোগসূত্রকে অস্বীকার করা যায না। বৃত্তি ও দেশনাম থেকে বংশগতভাবে এই কৈবর্ত ও কলিঙ্গী নামের উৎপত্তি, যুক্তভাবে এরা সকল ঐতিহ্যের অংশীদার। গঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গীদের সঙ্গে এদের সম্পর্কের কথা ঐতিহাসিক তথ্যসম্মত ও যুক্তি-নির্ভর।

কোন কোন গবেষক ভাগীরথীকে গঙ্গারিডিদের পূর্বসীমা, 'রাঢ'কে গঙ্গারিডি, এবং উড়িষ্যার গঙ্গা-বংশকে 'প্রাচীন গঙ্গারিডি বংশের ধারা' হিসাবে স্বীকার ক'রে নিযে গঙ্গা-রাজবংশের (অনন্তবর্মা ও মুকুন্দদেবের) সঙ্গে মাহিষ্যদের বংশগত যোগাযোগ স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবার চন্দ্রবংশীয-চোড়গঙ্গাকেও গঙ্গা-বংশীয হিসাবে ধরে চন্দ্রবংশীয-মাহিষ্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চেযেছেন। এছাড়া কৈবর্ত-রাজ দিব্যোক ও ভীমকে মাহিষ্য-বংশীয এবং একসঙ্গে পালরাজাদেরও মাহিষ্যবংশীয বলতে চেযেছেন। তাঁদের মতে—মোটামুটিভাবে বলতে গেলে যেহেতু নিম্নবঙ্গেই পরাক্রান্ত গঙ্গারিডি জাতির বসবাস ছিল, আর মাহিষ্যরা মাহিষ্মতী নাগরী পরিত্যাগ ক'রে নিম্নবঙ্গের তাম্রলিপ্ত, গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও পৌণ্ড্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জলাবৃত (কেবর্ত) অংশে প্রথম উপনিবিষ্ট হযেছিল, সেহেতু গঙ্গারিডিজাতি এই মাহিষ্য জাতির সঙ্গেই সম্পর্কিত'—("বাংলার মাহিষ্য সম্প্রদায় ও গঙ্গারিডি জাতি"—ডঃ তপেন্দ্রনারায়ণ দাশ : 'সপ্তডিঙা' পত্রিকার 'দোলসংকলন-১৩৯০,' পৃঃ ১৩-১৫ দ্রষ্টব্য)। আবার কোন কোন গবেষক রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের রাজপুতদের পদবীর সঙ্গে মাহিষ্যদের পদবীর সাদৃশ্য ও শাস্ত্রপুরাণাদিতে বর্ণিত জন্মতত্ত্বের সূত্র ধরে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাংলার মাহিষ্যরা আদিতে 'রাজপুত'—("মাহিষ্যরা কৈবর্ত নয়"—ডঃ মণীন্দ্রনাথ জানা : 'গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকা',—জানুয়ারী-১৯৮৬, পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য) ; কিন্তু

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, মাহিষ্যদের আদিনিবাস ছিল হিমালয় সন্নিহিত প্রদেশের সরযূতটে অর্থাৎ অযোধ্যা অঞ্চলে। এমন হতে পারে যে, সেখান থেকে মধ্যপ্রদেশের নর্মদাতটে অবস্থানকালে পার্শ্ববর্তী মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানে বসতি বিস্তারের ফলে সেখানে মাহিষ্যপদবী প্রচলিত হয়েছিল, সুতরাং মাহিষ্যরা আদিতে মাহিষ্যই ছিল—আদিতে তারা রাজপুত ছিলনা। আর, মাহিষ্যজাতি একাধারে তালুক্তি, মধ্যকলিঙ্গী, গাঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গী, গঙ্গারিডি, কোলাহলবংশীয়, চোড়গঙ্গবংশীয়, পালবংশীয়, দিব্যোকবংশীয় ইত্যাদি—যুক্তির দৃঢ় বাঁধুনিতে সবই সম্ভব, কিন্তু আমরা জানি যে, মেগাস্থিনিস ও প্লিনির বর্ণনায় গঙ্গাবিড়ি, গাঙ্গেয়-কলিঙ্গী, মধ্যকলিঙ্গী, তাম্রলিপ্তী (তালুক্তি) প্রভৃতি এক ছিলনা, প্রত্যেক জনগোষ্ঠী ও তাদের জনপদ পৃথক ও স্বতন্ত্র ছিল, তাদের রাজধানী এবং সেনাবাহিনীও পৃথক ছিল। সুতরাং একই মাহিষ্যজাতি একই সময়ে অনেক পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিগণিত ছিল (কারণ এই নামগুলি একই সময়ে বর্ণিত)—এ সিদ্ধান্তও সঠিক নয়, তা যদি হত, তাহলে এরা সব একাকার হয়ে যেত, এত সব পার্থক্য বজায় থাকত না। তবে মক্কোকলিঙ্গীরা মাহিষককলিঙ্গী হতে পারে, মধ্যকলিঙ্গীরা আদিকৈবর্ত হতে পারে, আর 'গঙ্গাবিদেস্-কলিঙ্গী' বলতে উভয় শ্রেণীর কৈবর্ত বা কলিঙ্গী এবং গঙ্গারিডিরা সম্মিলিতভাবে একটা পৃথক জনগোষ্ঠী গঠন করেছিল এমন হতে পারে, যেমনভাবে বর্তমানে মাহিষ্য জনগোষ্ঠীর (Race) মধ্যে আদিকৈবর্তদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কালক্রমে বিভিন্ন জনপদে উপনিবিষ্ট হয়ে সমবেতভাবে জাতি (Nation) গঠনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল সে কথাও আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সে হিসাবে, গঙ্গারিডিদের প্রবল-পরাক্রান্ত জাতি (Nation) গঠনে বাংলার সমূহ প্রাচীন জনগোষ্ঠীসহ মাহিষ্য ও কৈবর্তরাও সামিল হয়েছিল, আর সেই সূত্রে মাহিষ্যজাতি এই গঙ্গারিডিজাতির সঙ্গে সম্পর্কিত—এ কথা অনস্বীকার্য।

কোন কোন গবেষক মনে করেন—'গঙ্গা' এবং 'রিড্ই' এই দুই শব্দের সমবায়ে গঠিত হয়েছিল 'গঙ্গারিডি' শব্দ, যা মূলতঃ Austo-Asiatic কোলভাষাগোষ্ঠীর। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি উপজাতি সেই বিশাল কোলজাতির বংশধর। কোলগোষ্ঠীর ভাষান্তর্গত 'রাড়' শব্দ থেকে 'রিড্' শব্দের সৃষ্টি, রাড় শব্দের অর্থ লাল রঙের কাঁকুরে পাথর বা মোরামজাতীয়; রাড় দিশম্ অর্থাৎ 'রাঢ় দেশ' বা পাথুরে রূঢ় রুক্ষ মাটির দেশ। ভাগীরথীর পশ্চিমে কেবলমাত্র সেই রাঢ়দেশই গঙ্গারিডি, যা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম থেকে সুরু হয়ে প্রায় সমগ্র ছোটনাগপুর জুড়ে; সুতরাং কেবলমাত্র রাঢ়ের

দিকে বৃহৎবঙ্গের মানুষরাই ছিল সেই 'বিতর্কিত' গঙ্গারিডিজাতি। গঙ্গারিডির লোকদের যে চারহাজার হাতী ছিল, তা রাঢ় দেশ বলেই সম্ভব হয়েছিল, কাকদ্বীপ অঞ্চল বা দক্ষিণ-সুন্দরবন হাতীর উপযুক্ত নয়। গঙ্গা যতখানি রাঢ়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত, ততখানিই গঙ্গারিডি, পরবর্তী দেশের নাম "গঙ্গারিডি" না হয়ে শুধু "গঙ্গা" হতে আপত্তি নেই—('গঙ্গারিডি : নাম ও স্থান প্রসঙ্গ'—ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক : "কৌশিকী" শারদীয়-১৩৯৩, পৃঃ ১—৪ দ্রষ্টব্য)। আমরা গঙ্গারিডি শব্দের উৎস বিষয়ে প্রথমেই যথেষ্ট আলোচনা করেছি। তা সত্ত্বেও এ প্রসঙ্গে বলাই বাহুল্য যে, 'গঙ্গারিডি' শব্দটি মৌলিক শব্দ নয়—মৌলিক শব্দ 'গঙ্গারিদই (গঙ্গার—গঙ্গারিদ—গঙ্গারিদেস্, গঙ্গারিদই) গ্রীকশব্দ। 'গঙ্গারিদই' থেকে ল্যাটিন বানানে রূপান্তরিত রোমক শব্দ 'গঙ্গারিডি'—আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য সুকুমার সেন, ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিকগণের উদ্ভাবিত এই তথ্যের ভুল প্রমাণ করতে না পারলে, "কোলশব্দ 'গঙ্গারিড্' (গঙ্গা+রিড্) থেকে 'গঙ্গারিডি,' যার অর্থ 'গঙ্গার রূঢ়ভূমি' হিসাবে একমাত্র রাঢ়দেশ' —এই অভিনব তত্ত্বকে আমরা মেনে নিতে পারিনা। যুক্তির বাঁধুনি আলগা না হলেও, ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের পারম্পর্য রক্ষিত না হওয়ায় এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও গোড়ায় গলদের জন্য সবই ভিত্তিহীন। প্রথমেই আমাদের মেনে নিতে হবে যে, গ্রীক ও রোমক লেখকদের বিবরণই গঙ্গারিডি-ইতিহাসের প্রথম সূত্র।

মেগাস্থিনিস প্রথমে লিখেছিলেন, গঙ্গার শেষাংশে গঙ্গারিডিদের বাস। মেগাস্থিনিসের অভিমত সমর্থন ক'রে এবং তাঁর রচনা উদ্ধৃত ক'রে প্লিনি লিখেছেন, গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিদেসদের দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। অতঃপর টলেমি সুস্পষ্টভাবে মানচিত্র সহযোগে একই কথা বলেছেন তাঁর 'ভূগোল-বিবরণে'। তারপর আবার সলিনাস্ লিখেছেন যে, গঙ্গার সর্বনিম্ন বিস্তার ৮ মাইল ও সর্বাধিক বিস্তার ২০ মাইল এবং গভীরতা ১০০ ফুটের কম নয়, শেষপ্রান্তে যে জাতি বাস করে তার নাম গঙ্গারিদেস্। ডিওডোরাস্ লিখেছেন, গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পূর্বসীমা, টলেমিও দেখিয়েছেন, গঙ্গানদীর পূর্বদিকের খাতটি (আন্তিবোলা) গঙ্গারিডির পূর্বসীমা এবং পশ্চিমদিকের খাতটি (ক্যাম্বিসাম্) পশ্চিমসীমা। 'গঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গীর' রাজধানী ছিল পর্তেলিস্ অর্থাৎ পূর্বস্থলী অথবা বর্ধমান (দক্ষিণ-রাঢ়), আর তার দক্ষিণেই 'তালুক্তি' বা তাম্রলিপ্ত রাজ্য। তারপর সমুদ্রতীর ধরে মধ্যকলিঙ্গ (উৎকল), কলিঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি। গঙ্গারিডির মধ্যেই রাজ্য বা জনপদগুলিও স্বতন্ত্র ছিল।

মেগাস্থিনিস ও প্লিনির বর্ণনায় "ওডুম্বরী (Odomboerae)" নামক জনগোষ্ঠী ও জনপদের বিশেষ উল্লেখ আছে ; প্রাচীন বঙ্গের মানচিত্রে উত্তর রাঢ়ের উত্তরাংশ "ঔডুম্বরিক" হিসাবে পরিগণিত। এর দক্ষিণে বর্ত্তমান হুগলী নদীর পশ্চিমতীর ধরে মোহনা অঞ্চল পর্যন্ত কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। যাহোক, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী ও জনপদগুলির বিশেষ উল্লেখ গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণের বিবরণে আছে ; এছাড়াও তাঁরা পৃথকভাবে গঙ্গার শেষাংশে গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠী ও জনপদের সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। সে হিসাবে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রাঢ় এলাকায় ওডুম্বরী (উত্তর রাঢ়), গঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গী (বর্ধমান বা দক্ষিণরাঢ়) ও তালুক্তি (তাম্রলিপ্ত) যদি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী ও জনপদ হয়ে থাকে, তাহলে এগুলিকে গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠী বা জনপদ বলা যায় না এবং এগুলি অতিক্রম ক'রে আরো পশ্চিমে গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ছোটনাগপুর পর্যন্ত বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চলকে গঙ্গারিডি-জনপদ হিসাবে কল্পনাই করা চলেনা। অতএব গঙ্গারিডি জনপদটি ছিল এই জনপদগুলির পূর্বদিকে গঙ্গার শেষাংশে অর্থাৎ গাঙ্গোপদ্বীপ অঞ্চলে—এ কথা টলেমির বিবরণ ["All the country about the mouths of the Ganges is occupied by the Gangaridai, with this city—Gange, a royal city (Regia) —long.146 degree, Lat.19 degree 15 feet."] অনুযায়ী যেমন ঠিক, মেগাস্থিনিস প্লিনি সলিনাস ডিওডোরাস প্রমুখ ঐতিহাসিক-গণের বর্ণনা অনুযায়ীও তেমন ঠিক। স্ট্রাবোর বর্ণনায় আমরা গঙ্গানদীর একটিমাত্র মোহনার উল্লেখ পাই ; কিন্তু টলেমি সুস্পষ্টভাবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সহযোগে গঙ্গার পাঁচটি প্রধান মুখের উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে এই পাঁচটি মুখের অন্তর্বর্তী সমগ্র দেশ গঙ্গারিডিদের অধিকারে ছিল। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ অকাট্য যুক্তিতথ্য সহকারে যা বলেছেন, তাতে টলেমির সুস্পষ্ট বিবরণই সমর্থিত হয়। অতএব, "গঙ্গা যতখানি রাঢ়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ততখানিই গঙ্গারিডি এবং বঙ্গোপসাগরকূলে ভাগীরথীর পূর্বতীরে গঙ্গারিডির অস্তিত্ব ছিলনা।"—'কৌশিকী' পত্রিকার এই অভিনব তত্ত্বে যুক্তির বাঁধুনি আল্‌গা না হলেও, এতে ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের মূল সূত্র অবলম্বিত হয়নি। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয় একজন কুশলী সমালোচক ; পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে

তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় মন্তব্য করেছেন যে, গঙ্গারিডি বিষয়ে আমার যুক্তির বাঁধুনি আল্‌গা, যোগসূত্রহীন, স্বকপোলকল্পিত ও পণ্ডশ্রম। তারপর তিনি তাঁর সুখ্যাত গবেষণা-পত্রিকায় এই অসাধারণ তত্ত্ব সযত্নে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাতে আমরা সাধারণ পাঠক সহজেই বিভ্রান্ত, এমন আরো অনেকেই এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রাঢ় ভূমের ঐতিহ্যকে আমরা অস্বীকার করি না—এই দেশ পুরাতন-ঐতিহাসিক যুগ থেকে একদা প্রসুহ্ম ও সুহ্ম নামে সুবিস্তৃত ছিল। তাম্রযুগের সূচনা থেকে তাম্রলিপ্তের ঐতিহ্যের কথা অনস্বীকার্য, তাম্‌লিট্ থেকে প্রসিদ্ধ 'তামিল' কথাটির উদ্ভব হতে পারে, এ তথ্যও হয়ত অমূলক নয়। দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাগৈতিহাসিক বসতিস্তর আবিষ্কৃত হলেও, উপবঙ্গের সভ্যতা অর্থাৎ গঙ্গারিডি সভ্যতা 'পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে উদ্‌ঘাটিত সভ্যতার চেয়ে প্রাচীনতর কোন মতেই নয়', ভাষাতাত্ত্বিক বিচারেও 'রাঢ়ীবোলি' বিশেষ ঐতিহ্যের ধারক। কোল-অধ্যুষিত রাঢ়ভূম বাঙালী-সভ্যতার আদিপীঠভূমি। প্রাচীনকাল থেকে হস্তীপ্রচরণক্ষেত্র হিসাবে রাঢ় অঞ্চলের খ্যাতি অব্যাহত। রাঢ়দেশের পূর্ব-দক্ষিণপার্শ্বস্থ প্রতিবেশীরাজ্য দক্ষিণবঙ্গেও রণহস্তীবাহিনী প্রচলনের কথা বিদেশী লেখকদের বিবরণে এবং দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বিবৃত হয়েছে। এই দক্ষিণবঙ্গেরই পশ্চিমসীমান্ত থেকে উৎকলের পথে কলিঙ্গ অভিমুখে যাওয়ার সময় দিগ্বিজয়ী রঘু হস্তীসেতু রচনা ক'রে কপিশা বা কংসাবতী-মোহনা পার হয়েছিলেন—একথা গুপ্তযুগে মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশে' বর্ণনা করেছেন, পক্ষান্তরে এ অঞ্চলেরও নিজস্ব হস্তীবাহিনী ছিল বোঝা যায়। মহাভারতেও পুণ্ড্রবঙ্গের নৃপতিগণের রণহস্তীবাহিনীর কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এ অঞ্চলের 'হাতীয়াগড়ে' মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিখ্যাত হস্তীশালা ছিল—'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী'তে এর সমর্থন মেলে। আগেকার দিনে এই কলকাতা এলাকাতেও হাতী পোষার রেওয়াজ ছিল শোনা যায়। দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর এবং আরো অনেক স্থানে মাটির নীচে থেকে হস্তীকঙ্কালের ফসিল প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্রে রক্ষিত (কাকদ্বীপে ও পাঁচ নম্বর লাটে প্রাপ্ত) কঙ্কালের ফসিলকে কোন কোন গবেষক হাতীর কঙ্কাল বলে মন্তব্য করেছেন। এসব থেকে একটা বাস্তব সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, একদা এ অঞ্চলে হাতীর প্রাদুর্ভাব ছিল—তা সে বন্য হাতী হোক, অথবা পোষা হাতীই হোক। সুতরাং গঙ্গামোহনা অঞ্চলে গ্রীকবর্ণিত রণহস্তীবাহিনীর বিবরণকে অবাস্তব বলা যায় না।

যাহোক, 'গঙ্গার মোহনা অঞ্চলের ব-দ্বীপসমূহে গঙ্গারিডিদের মূল বাসভূমি ছিল এবং তাদের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গঙ্গানগরকে অবলম্বন ক'রে গঙ্গা-জনপদ ও গঙ্গারিডি রাজ্য গড়ে উঠেছিল'—বিদেশী লেখকদের রচনাসূত্র অবলম্বনে স্থিরীকৃত এই মতবাদে আমরা বিশ্বাসী। তার আগেও পুণ্ড্রনগরকে (পুড্‌নগল) অবলম্বন ক'রে পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য একদা এই গঙ্গাসাগরতীর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল। সেই সূত্রে, প্রায়-সমসাময়িককালে পাটলিপুত্রের ন্যায় পুণ্ড্রনগরের সঙ্গেও গঙ্গানগরের বাণিজ্যিক, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক লেনদেন এবং প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বোঝাপড়া ও যোগসূত্র থাকাই স্বাভাবিক। ম্যাক্রিণ্ডলের পুস্তকে প্রকাশিত মানচিত্রে আমরা উপবঙ্গের পূর্বদিকে এবং পশ্চিমদিকে বিস্তৃত বৃহত্তর গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের পরিচয় পাই—এই রাষ্ট্র পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বৃহত্তর রাঢ় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল দেখা যায়, এক্ষেত্রে গঙ্গারিডি একটি 'জনগোষ্ঠী (Race or Tribe) বা জনপদমাত্র নয়'—গঙ্গারিডি একটি 'জাতি (Nation) ও রাষ্ট্র' এবং রাঢ়ভূমের ছোট ছোট জনপদগুলি তথা কলিঙ্গের কিছু অংশ এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া গঙ্গারিডি, কলিঙ্গ ও প্রাসী—এই তিনটি বৃহৎশক্তি মিলিত ভাবে গড়ে তুলেছিল একটি যুক্ত-সাম্রাজ্য (Confederation), শতধা-বিচ্ছিন্ন উপমহাদেশে মগধসম্রাট ধননন্দের অধিনায়কত্বে পূর্বভারতের এই মিত্রশক্তি ভারতবর্ষের প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল—যে শক্তির সংবাদে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এদিকে অগ্রসর না হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। ডিওডোরাস প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই যুক্তসাম্রাজ্যকে "গঙ্গারিডি" যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করায়, নামভূমিকায় গঙ্গারিডিদের গৌরব সারা বিশ্বে অধিক প্রচারিত হয়েছে—এসব কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধনের অভ্যন্তরে গাঙ্গেয়দ্বীপ অঞ্চলে গঙ্গারিডিদের নিজস্ব রাজ্যে যারা বসবাস করত, তাদের বংশধরেরা বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, দলুই ক্ষত্রিয় কর্মার ক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, মাহিষ্য, সদ্গোপ, হৈহয়ক্ষত্রিয় (১৯১১ সালের লোকগণনায় 'হাড়ি' জাতির দাবীকৃত নাম 'হৈহয়ক্ষত্রিয়' সেন্সাস রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে) প্রভৃতি ( ) ক্ষ, জাতি ও কুম্ভকার, নাপিত প্রভৃতি প্রাচীন বংশীয়েরা এবং ধর্মান্তরিত মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতি ও কোলজাতীয় আদিবাসীবৃন্দ। তৎকালে গঙ্গাবন্দর-সন্নিহিত নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে যাদের সংখ্যাধিক্য ছিল, তারাই

ছিল মূল গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠীর সূত্রধার, যাদের দলপতি (রাজা) বাস করতেন গঙ্গাবন্দরে। কিন্তু একদা সেই সীমিত জনপদ ও রাজ্যের আয়তন অতিক্রম ক'রে—সুসমৃদ্ধ সুসংহত ও প্রবল-পরাক্রান্ত বৃহত্তর গঙ্গারিডি রাষ্ট্র ও মহাজাতি গঠনে সমগ্র রাঢ়দেশ তথা বৃহত্তর বঙ্গ এবং সমূহ প্রাচীন বাঙালী জনগোষ্ঠীর অবদান ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই প্রাচীন বাঙালীদের রক্ত বর্তমান বাঙালীদের শিরায় শিরায় এখনও প্রবহমান। নৃতাত্ত্বিক বিচারে সমগ্র বাঙালী মহাজাতি অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় মোঙ্গলয়েড নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, উত্তরকালে এদের সঙ্গে কিছু ব্রাহ্ম্যবাদী আর্য নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটতেও পারে।

নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে 'আদি অষ্ট্রালয়েড' বা কোলগোষ্ঠীর মানুষেরা এই বৃহদ্বঙ্গে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। বর্তমান বাংলাভাষার মধ্যে কোলভাষার উপকরণ সর্বাধিক। 'গঙ্গা' শব্দটও মূলে অষ্ট্রিক. 'গদগদা—গগ্‌দা—গঙ্গা' (—ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'—১৬।৭।১৯৮৭ দ্রষ্টব্য)। নৃতাত্ত্বিকগণের অভিমত—ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদিসহ কোনও বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশুদ্ধ আর্যরক্ত নেই, সকল বাঙালীর দেহে সেই অষ্ট্রিক দ্রাবিড় মোঙ্গল, পুণ্ড্র-বঙ্গ-সুহ্ম প্রভৃতি প্রাচীন নরগোষ্ঠীর মিশ্র রক্তধারা আজিও প্রবাহিত, মতান্তরে, তারা সবাই ছিল প্রাচীন আর্য ভাষাভাষীদের শাখা প্রশাখা। 'তারা কেবলমাত্র বর্ণহিন্দুদের পূর্বপুরুষ ছিল' মনে ক'রে কেউ কেউ তপশীলীদের বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করেছেন, কিন্তু 'তারা ছিল বাংলার তপশীলী জাতি, উপজাতি, বর্ণহিন্দু, এমন কি অহিন্দুদেরও পূর্বপুরুষ।' মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অষ্ট্রিক (শবর), দ্রাবিড় যবন, কিরাত, পুণ্ড্র, কলিঙ্গী (কৈবর্ত), মাহিষক প্রভৃতি জাতিকে প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতিরূপে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং আর্য হোক বা অনার্য হোক—বাংলার বর্ণহিন্দু, তপশীলী জাতি ও উপজাতি, বাঙালী মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ যাই হোক—এরা সকলেই, 'আন্তর্জাতিক ও বিশ্বব্যাপীখ্যাতিসম্পন্ন গাঙ্গেয়মহাজাতি গঠনের রূপকারদের বংশধর। সে হিসাবে, সুন্দরবনসহ বৃহদ্বঙ্গের অধিবাসী বিভিন্ন স্তরের মানুষ, আমরা সকলে সেই 'বিবিধের মধ্যে মহামিলন-প্রয়াসী গঙ্গারিডিদের' গৌরবময় ঐতিহ্যের মহান্ উত্তরাধিকারী।

মেগাস্থিনিস ও প্লিনি বর্ণিত শত-জনগোষ্ঠী ও জনপদসমূহ

প্লিনি মেগাস্থিনিসের রচনার উদ্ধৃতিসহ একশত সংখ্যক ভারতীয় জনগোষ্ঠীর (Race or Tribe) নাম উল্লেখ করেছেন—Isari (ইসরী),

Cosyri (খশীর), Izgi, Chisiotosagi (কিরাত ?), বহু শাখায় বিভক্ত Brachmanae (ব্রাহ্মণগণ) ও Maccoocalingae (মাহিষক-কলিঙ্গী), এবং Emodus (হিমালয়) পর্বতসন্নিহিত Imaus (হিমবান) জাতি। তারপর নৌচলনোপযোগী Prinas (পর্ণাশা) ও Cainas (কৈনস) নদী গঙ্গায় পড়েছে।

Calingae (কলিঙ্গীজাতি) সমুদ্র তীরবাসী। তদূর্ধে Mandei (মন্দ্য) ও Malli (মল্ল) জাতি। গঙ্গানদীর শেষাংশে বাস করে Gangarides (গাঙ্গেয়) জাতি। Calingae (গঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গী) জাতির রাজধানী Portalis (পূর্বস্থলী অথবা বর্ধমান)। গঙ্গায় একটি-প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে, তাতে Modogalingae (মধ্যকলিঙ্গী) নামে একটি-মাত্র জাতি বাস করে। তারপর Modubae (মৌত্তিব), Molindae (মলদ) Uberae (ভর), Preti (প্রেত), Calissae (কালীশ), Sasuri (স-সুর), Passalae (পাঞ্চাল), Colubae (কোলুট), Orxulae (অক্ষুল), Abalae (অবল), Taluctae (তাম্রলিপ্তি), এদের পরে অধিকতর পরাক্রান্ত Andarae (অন্ধ্র) জাতি, Dardae (দরদ) গণের দেশে প্রচুর স্বর্ণ ও Setae (শাতক)-দের দেশে প্রচুর রূপা পাওয়া যায়।

সারা ভারতবর্ষে Prasii (প্রাচ্য বা মগধগণ) পরাক্রম ও প্রতিপত্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ, পাটলিপুত্র তাদের রাজধানী। এই জাতির পরে, আরও ভিতরে Monedes (মনেদী = মহানদী তীরবর্তীগণ ?) ও Suari (শবর) জাতি বাস করে। প্রাচ্যজাতির পার্বত্য প্রদেশে Pygmies (বামন)-দের বাস।

এছাড়া Cesi (খস), Centriboni (ক্ষত্রিবনীয়), Megallae (মাবেল), Chrysei (করোঞ্চ), Parasangae (পরসঙ্গ), Asangae (অসঙ্গ), Dari (ধার), Surae (সুর), Maltecorae (মাল্তিক), Singhae (সিংহ), Marohae (মরুহ), Rarungae (রকঙ্গ), Maruni (মরুণ), Nareae (নায়র), Oraturae (ওরাতুর, বর্তমান রাঠোর জাতির পূর্বপুরুষগণ), Varetatae (বরতত), Odomboerae (ওডুম্বরী), Salabastrae (সলবস্ত্র), Horatae (হোরত), Charmae (খর্মা), Pandae (পাণ্ড্য), Syrieni (সুরিয়নি), Derangae (ঝাড়েঙ্গা), Posingae (পসিঙ্গ), Buzae (বুদ্ধা), Gogiarei (কোকারি), Umbrae (উম্বানি), Nereae (নারোনি), Brancosi (ব্রঙ্কোসি), Nobundai (নুবীতা), Cocondae (কোকোনদ), Nesei

(নিশা), Pedatrırae (পদত্রির), Solobrıasae (শূলবিষস) এবং Olostrae (ওলস্ত্র) জাতি।

তারপর সিন্ধুনদের দিকে সহজবোধ্য ক্রমানুসারে Amatae (অমত), Bolıngıe (ভৌলিঙ্গ), Gallıtalutıe (গিহেলাট), Dımurı (ডুম্‌রা), Megarı (মোকব), Ordabae (অর্দব), Mesae (মজরি), Urı (হৌর), Sıleni (স্থলন), Organagae (অর্ঘনাগ), Abıoıtae (অববর্ত), Sıbarae (সৌভীর), Suartae (স্বার্ত), Saıophıges (সরভাম), Soıgıe (সর্গ), Baraomatae (ববাহ্মত), Umbrıttıe (অম্বষ্ঠ) এবং Aseıe (অসন) । ককেশস্‌ পর্বতের পাদদেশে বসবাস করে Soleadıe (শৈলদ), Sondrae (সুন্দর), Sımırabrıae (সমরবীর), Sambruceni (সম্বরসেন), Bısımbıtıe (বিষমবৃত্ত), Osıı (ওস), Antıxene (অস্থিক্ষণ), Taxıllae (অক্ষশীলা), Amanda (অমন্দ=গান্ধার ?), Peucolatae (পুকলবতী), Arsagalıtae (আর্যগলিত), Geretae (গৌরী), Asoı (আশয), Gedrosı (গেড্রোসী), Arachotae (আরাখোটী), Arıı (আয), ও Paropamısadae (পরোপমিসদ) ।

প্লিনির বর্ণনায় ভারতের এই একশত জনগোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন যে, অনেক গ্রন্থকার Astacanı (অশ্বক—আফগান)-দিগকেও ভারতের অন্তর্ভূক্ত করে থাকেন। বিশেষ নদনদী ও স্থানসমূহের পরাস্পরিক দূরত্ব, জনপদ ও জনগোষ্ঠীসমূহের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিও তিনি যথাসম্ভব বর্না করেছেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ উদ্ধৃত করে অন্যান্য লেখকগণ আরও কয়েকটি জাতির নাম উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া আরও কতকগুলি অবাস্তব জাতির নাম মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, সম্ভবত সেগুলি তিনি নানা জনশ্রুতি ও কল্পকাহিনী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন , ইযেতি, কবন্ধ প্রভৃতির ন্যায় সেগুলির অস্তিত্ব বাস্তবে মেলেনা। প্লিনির হিসাবে রোমক মাইল অনুসারে বিপাশা (Hypasis) থেকে শতদ্রু (Hesıdorus) ১৬৮ মাইল, শতদ্রু থেকে যমুনা (Jomanes) ১৬৮ মাইল (কোন কোন পুঁথিতে ৫ মাইল বেশী), সেখান থেকে গঙ্গা পর্যন্ত ১১২, রাধাপুর (Rhodapha) পর্যন্ত ১১৯ (কেউ বলেন এই দূরত্ব ৩২৫ মাইল), কালিনীপক্ষ (Kalınıpaxa) নগর ১৬৭½ মাইল (অন্য মতে ২৬৫ মাইল), সেখান থেকে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম পর্যন্ত ৬২৫ মাইল (অনেকে বলেন আরও ১৩ মাইল বেশী) এবং পাটলিপুত্র (Palibothra)

নগর পর্যন্ত ৪২৫ মাইল, পাটলিপুত্র থেকে গঙ্গাসাগর সঙ্গম পর্যন্ত ৭৩৮ মাইল (মেগাস্থিনিসের বর্নিা অনুযায়ী ছ হাজার স্টাডিয়ামের সমান)।

ক্রিশ্চিয়ান লাসেন, অধ্যাপক ই. এ. শোয়ানবেক, জেনারেল আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, ভিন্সেন্ট এ. স্মিথ, জে. ডবলিউ. ম্যাক্রিণ্ডল, রজনীকান্ত গুহ প্রমুখ পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ইতিহাসবিদগণ প্রাচ্যভাষা ও প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুশীলনের মাধ্যমে নদী পাহাড় মরুভূমি জঙ্গল জনপদ ও জনগোষ্ঠীর দুর্বোধ্য নামগুলি সনাক্তকরণ পূর্বক বিবরণগুলির বাস্তবতা প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন। আমি রজনীকান্ত গুহ অনূদিত (ডঃ বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত) 'মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ' অবলম্বনে এবং ম্যাক্রিণ্ডলের 'এ্যানসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাজ ডেস্‌ক্রাইব্‌ড্‌ বাই মেগাস্থিনিস এ্যাণ্ড্‌ আরিয়ান' গ্রন্থের সাহায্যে এই তালিকা সংকলন করেছি। রজনীকান্তের গ্রন্থে মক্কোকলিঙ্গী — 'মথকলিঙ্গী' এবং মোদগলিঙ্গী = 'মোদকলিঙ্গী' লিখিত হয়েছে, তৎপরিবর্তে আমি 'মাহিষক-কলিঙ্গী' ও 'মধ্যকলিঙ্গী' নাম দুটি ব্যবহার করেছি। মেগাস্থিনিস, ডিওডোরাস, আরিয়ান, স্ট্রাবো প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতের সকল অধিবাসীগণকে গুণ ও কর্ম অনুসারে আরো সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) পণ্ডিত (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ), (২) কৃষক, (৩) পশুপালক ও শিকারী. (৪) শিল্পী ও পণ্যজীবী, (৫) যোদ্ধা, (৬) পর্যবেক্ষক (অমাত্য বা মহামাত্র) এবং (৭) মন্ত্রী। পণ্ডিতগণ সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা কম, কিন্তু মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ, উপাসনা ও অদৃষ্টগণনা এঁদের প্রধান কাজ। কৃষকরা নিরীহ প্রকৃতির ও সংখ্যায় সর্বাধিক, যুদ্ধকালেও এরা নিরুপদ্রবে মাঠে কাজ করে। পশুপালকরা যাযাবর, পশুপালন, ভারবাহী পশু ক্রয়-বিক্রয়, বন্য পশু ও শস্য-বিনষ্টকারী পক্ষীশিকার এদের কাজ। শিল্পীরা অস্ত্র-শস্ত্র, কৃষিযন্ত্রপাতি, নৌকা ইত্যাদি প্রস্তুত করে। যোদ্ধাগণ সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, যুদ্ধের কাজ ছাড়া এদের অন্য কাজ নাই। পর্যবেক্ষকগণ দেশের সমূহ বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে রাজা বা দলপতিকে জানান। মন্ত্রীগণ জ্ঞানে ও ন্যায়পরায়ণতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, এঁরা রাজকার্যে পরামর্শ দেন।

সলিনাস গঙ্গানদীর বিস্তার ও গভীরতা সম্পর্কে বর্ণনার পর, গঙ্গারিডিদের কথা এবং তাদের রাজার প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক বাহিনীর সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তারপরেই লিখেছেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কেউ চাষের কাজ করে, অনেক ব্যক্তি পেশাগতভাবে যোদ্ধা এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি ব্যবসাজীবী, দেশশাসন,

বিচারবিভাগ ও মন্ত্রীত্ব কার্যে সর্বাধিক সম্পদশালী ও সম্ভ্রান্তবংশীযগণ নিযুক্ত থাকেন এবং পঞ্চম জাতি সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যাক্তিদের নিযে গঠিত যাঁরা জীবনে বিতৃষ্ণ হলে আগুনে ঝাঁপ দিযে মৃত্যুবরণ করেন, এছাড়া আজীবন বনবাসী হস্তীশিকারী কঠোর-সম্প্রদাযভূক্ত আর একটি জাতি তাদের পোষা শান্ত হাতী দ্বারা চাষের কাজও করে এবং যানবাহনের কাজে কেবলমাত্র হাতীকেই ব্যবহার করে। এরপর তিনি বহু জনাকীর্ণ গাঙ্গেয দ্বীপের একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতির কথা বর্ননা করেছেন এবং এসবের পর প্রাচ্য জাতি ও পাটলিপুত্র নগরের বিবরণ প্রদান করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা জাতির ক্ষেত্রে এই শ্রেণীবিভাগের বিষয আলোচিত হযেছে, তাহলে এক একটি জনগোষ্ঠী বা জাতি তাদের দেশশাসন কার্যের প্রযোজনে এক এক রাজা বা দলপতির অধীনে এভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেছিল বোঝা যায। ভারতবর্ষের শত জনপদ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে গঙ্গারিডি অন্যতম, সুতরাং গঙ্গারিডিদের মধ্যেও এ ধরণের শ্রেণীবিভাগ ছিল বলে বিদেশী লেখকগণের বর্ণনা থেকে সহজ-ভাবেই অনুভূত হয। বিশেষ করে, সলিনাস বর্ণিত এই শ্রেণীবিভাজন গঙ্গারিডিদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হযেছিল বলে সঠিকভাবে ধরে নেওযা চলে। কিন্তু বিদেশীদের কোন কথাই বেদবাক্য নয, তাঁরা যা দেখেছিলেন, শুনেছিলেন এবং ইতিহাস লেখার প্রযোজনে গ্রন্থাদি অনুশীলনের মাধ্যমে অবগত হযেছিলেন, সেগুলিই সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতিরঞ্জিত ও অস্বাভাবিক অংশগুলি বাদ দিলে, বিদেশী লেখকদের এই বিবরণগুলি আমাদের দেশের প্রাচীন সামাজিক-সংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার কাজে বিশেষ উপকরণ হিসাবে গণ্য হতে পারে, ক্ষেত্রবিশেষে বেদ-পুরাণের সূত্রগুলির চেযে এগুলি কোন অংশে কম নয।

প্লিনি লিখেছেন যে, নন্দবংশীযদের আমলে কলিঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যের অধিকারে ছিল, প্রতিরক্ষার প্রযোজনে গঙ্গারিডি ও প্রাসীর কনফেডারেশন ফেডারেশনে পর্যবসিত হযেছিল ধননন্দের আমলে—এ কথাও সহজেই বোঝা যায, সুতরাং ধননন্দ বা ক্সান্দ্রামেসের সমযে সমগ্র 'গঙ্গারিডি, কলিঙ্গ ও প্রাসী' অন্তত কিছুকালের জন্যও ফেডারেশনে পরিণত হযেছিল এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশীযদের সঙ্গে যুদ্ধের সময নিজ স্বার্থেই গঙ্গারিডি ও কলিঙ্গের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিযে তাদের বিরুদ্ধতা না করায, এই রাজ্যগুলি আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন হযে গিযেছিল। তাই চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময এদের কনফেডারেশনের অস্তিত্বও ছিল না। সেজন্য মহারাজ অশোক তাঁর সর্বভৌমত্বের প্রযোজনে কলিঙ্গ আক্রমন করেছিলেন।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর গঙ্গাভূমি

"কলিঙ্গ জয় অশোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়েছিল কেন? প্লিনি বলেছেন যে, কলিঙ্গ নন্দসাম্রাজ্যের অংশ ছিল। সুতরাং অনুমান করা চলে যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কলিঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তাই অশোকের পক্ষে হয়ত কলিঙ্গ জয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল" (প্রাচীন ভারতের ইতিহাস—সুনীল চট্টোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, ২য় মুদ্রণ-১৯৮৫, পৃঃ ২৭০)। প্লিনি যেমন কলিঙ্গকে নন্দ সাম্রাজ্যের অংশ বলেছেন, ডিওডোরাস ও কার্টাস তেমন মগধসম্রাট ধননন্দকে গঙ্গারিডি ও মগধের রাজা বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। ডিওডোরাসের মতে, গঙ্গার অববাহিকায় গঙ্গারিডিরা শ্রেষ্ঠ জাতি। সে হিসাবে 'গঙ্গারিডি' বলতে 'বৃহত্তর গঙ্গাভূমি' অর্থাৎ পুণ্ড্র, বঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গকে বোঝায়। 'সভ্যতার বিকাশকাল তাম্রাশ্মযুগ' থেকে প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তের গুরুত্ব অনুযায়ী এই বিশাল অঞ্চলকে 'বৃহত্তর তাম্রলিপ্ত' এলাকা হিসাবেও গণ্য করা যায়। অতএব ডিওডোরাস বর্ণিত 'গঙ্গারিডি'র কনফেডারেশন হিসাবে আমরা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের বিস্তীর্ণ এলাকাকেই ধরব, যে বিশাল এলাকার যুক্ত-রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। এই বৃহত্তর গঙ্গাভূমি বা বৃহদ্বঙ্গ অর্থাৎ বৃহত্তর তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে সর্বপ্রথম পঞ্চদেশোৎপত্তির কথা জানা যায় মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে, সেই পাঁচটি দেশের নাম হল—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। কৌম জনপদরূপে এই দেশগুলির পত্তন হয়েছিল আরো অনেক আগে, যখন গাঙ্গোপদ্বীপ এলাকায় জনবসতি ছিলনা, রামায়ণে এই নিম্নভূমি অঞ্চল 'রসাতল' নামে বর্ণিত হয়েছে। তারপর মহাভারতীয় যুগ থেকে আমরা এই গাঙ্গোপদ্বীপের নিম্নভূমিতে জনবসতির উল্লেখ পাই। মহাভারতীয় যুগে উপবঙ্গসহ বৃহত্তর বঙ্গে এই পঞ্চদেশোৎপত্তির সময় থেকে যে সভ্যতার পত্তন হয়েছিল, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক, রোমক ও মিশরীয় ঐতিহাসিকগণ তাকে গঙ্গারিডি সভ্যতা অর্থাৎ গাঙ্গেয় সভ্যতা হিসাবে অভিহিত করেছেন।

দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আমরা এই পাঁচটি দেশকে ক্রমান্বয়ে আরো কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত দেখতে পাই—পাঞ্চাল, মগধ, ঔডুম্বরিক, কর্বট, শিবি, চেত, তাম্রলিপ্ত, ওড্র, উৎকল, অন্ধ্র, গাঙ্গোপদ্বীপ বা উপবঙ্গ, উন্মত্তগঙ্গ, লোহিতগঙ্গ, লৌহিত্যদেশ, কামরূপ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ ইত্যাদি। বিদেশী লেখকগণের বিবরণেও আমরা পাঞ্চাল, মগধ (প্রাসী), ওডুম্বরী, কর্বট (গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ), তাম্রলিপ্ত, উৎকল (মধ্যকলিঙ্গ), কলিঙ্গ,

গাঙ্গেপদ্বীপ (গঙ্গারিডি) প্রভৃতি জনপদের সবিশেষ উল্লেখ পাই। রাঢ়, বরেন্দ্র, গৌড়, সমতট প্রভৃতি নাম ঐ সময়ের অনেক পরে প্রচলিত হয়েছিল। গঙ্গায় একটি বৃহৎ দ্বীপকে 'মধ্যকলিঙ্গ' বলায় কোন কোন গবেষক ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যবর্তী মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার অংশবিশেষে 'কাশিম-বাজার দ্বীপ' নামে একদা অভিহিত স্থানকে মধ্যকলিঙ্গরূপে অনুমান করেছেন। তাঁদের ধারণা, কলিঙ্গের প্রতিবেশী অঞ্চল হিসাবে পুণ্ড্র বঙ্গের এই এলাকাকে গ্রীক ও রোমান লেখকগণ 'মধ্যকলিঙ্গ' বলতে চেয়েছেন. কিন্তু ঐ অঞ্চল কোন কালেই কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিলনা, তাই এই অনুমানকে বাস্তবসম্মত বলা যায় না। বরং ভাগীরথীর পশ্চিমে মেদিনীপুরের অংশবিশেষ থেকে আরম্ভ করে হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের কতকাংশকে গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ হিসাবে ধরা যেতে পারে, কারণ কলিঙ্গ ও গঙ্গারিডির অংশবিশেষের মধ্যে এই রাজ্য গঠিত হয়েছিল, মহাভারতে এই অঞ্চল কর্বট রাজ্য নামে বর্ণিত হয়েছে (ডঃ অতুল সুরের মতে, কৈবর্তগণ কর্বট-কৌমের বংশধর), সুতরাং গাঙ্গেয-কলিঙ্গের রাজধানী **Portalis** অর্থে পূর্বস্থলী বা বর্ধমান, স্বরবিজ্ঞানভিত্তিক এই মতবাদ তথ্যনির্ভর ও যুক্তিসম্মত। তাম্রলিপ্তের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রাচীন গাঙ্গেযদ্বীপের অস্তিত্বের কথা আমরা আলোচনা করেছি, ঐ অঞ্চল একদা পুরোপুরি কলিঙ্গের অধিকারে ছিল। সে হিসাবে কলিঙ্গ ও গাঙ্গেয-কলিঙ্গের মধ্যবর্তী ঐ এলাকাকে বিদেশী লেখকগণ মধ্যকলিঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন।

বর্ধমান বিভাগে শিবি ও চেত নামে দুটি প্রাচীন রাষ্ট্র সম্পর্কে মণীষী-গবেষক ডঃ অতুল সুর মহাশয় বলেছেন যে, টলেমির মানচিত্রে প্রদর্শিত বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের সন্নিকটে 'সিত্রাম' শব্দটি 'শিবিপুরম্' এর রূপান্তর, বেস্সান্তর জাতকে আমরা শিবি দেশের উল্লেখ পাই, আর তার দক্ষিণে বর্তমান ঘাটাল মহকুমার চেতুয়া পরগণা অঞ্চলে ছিল চেতরাজ্য, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহে শিবি ও চেত রাষ্ট্রদ্বয়কে 'মহাজনপদ' রূপে অভিহিত করা হয়েছে ('বাঙলার সামাজিক ইতিহাস,' পৃঃ ২৬ – ২৯ দ্রষ্টব্য)।

যাহোক, এখন আমাদের আলোচনার বিষয় বৃহত্তর গঙ্গাভূমির আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি পর্যালোচনা। ভারতের অন্যতম প্রধান অর্থনীতিবিদ ও বঙ্গসংস্কৃতির সব্যসাচী-গবেষক ডঃ অতুল সুর তাঁর 'হিস্ট্রি এ্যাণ্ড কাল্চার অব বেঙ্গল', 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস,' 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থে বৃহদ্বঙ্গের আর্থসামাজিক, নৃতাত্ত্বিক প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা

করেছেন। গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্রের বিশেষ উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠাপোষকরূপে পুস্তকাদি প্রদানের মাধ্যমে, এই অধ্যায়ের পর্যালোচনায় তিনি আমাকে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

প্রাচীন বাঙলায় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল প্রাক্-দ্রাবিড় অর্থাৎ অষ্ট্রিকগোষ্ঠীভুক্ত জাতিসমূহের লোকেরা। পুরাতন প্রস্তরযুগের লোকেরা সবাই পশুপক্ষী শিকার ও বন্য ফলমূল আহরণের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করত। নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে অষ্ট্রিকভাষাভাষী নরগোষ্ঠী কৃষিকাজ সুরু করেছিল, নানাবিধ ফল, শাকসবজি উৎপাদন এবং এই বাঙলামুলুকে প্রথম ধানচাষের প্রবর্তন করেছিল তারাই। তারপর ক্রমে বাঙলায় সকল জাতের মানুষের প্রধান জীবিকা হয়ে দাঁড়াল এই কৃষি। হিউএন্‌চাঙের ভারত আগমনকালে ব্রাহ্মণদেরও কৃষিকাজ করার কথা জানা যায়; তার আগেও ঐ ধারাই প্রচলিত ছিল। ক্ষেতের অধিকারী হিসাবে 'ক্ষেত্রী' শব্দ ক্ষত্রিয়-শব্দের উৎস বলে অনেকে মনে করেন। ব্রাহ্মণ্যপ্রথা পুনঃ-প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ধর্মী প্রাচীন বাংলায় দেবতার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের পরিবর্তে কর্মযজ্ঞে বাধ্যতামূলকভাবে আত্মনিয়োগ করতে হত প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে। ব্রাহ্মণ্য বর্ণবৈষম্যের বিধিনিষেধ এখানে অচল ছিল; তাই বহির্বঙ্গের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এদেশে বসবাসের জন্য এলে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারত না বলে এদেশে আসা নিষিদ্ধ ছিল, তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে এলে, স্বদেশে ফিরে পুনঃস্তোম যজ্ঞ করে তবে তাদের সমাজে উঠতে হত। তাই এদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পুনরুত্থান ঘটেছিল অনেক পরে, বৌদ্ধ যুগের শেষ পাদে নবম-দশম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য, বৃহস্পতি, উদয়ণাচার্য প্রমুখের অক্লান্ত প্রচার-কৌশলে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বৎসর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল।

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন নামের অনেক প্রকার ধান উৎপন্ন হয়ে আসছে এ অঞ্চলে। বর্তমানকালে আউশ, আমন, বোরো এই তিন জাতীয় ধানের মধ্যে—সরু ধান রূপশাল, চামরমণি, দুধেরসর প্রভৃতি, মাঝারি ধান পাটনাই, ট্যাংরা, নোনাশাল প্রভৃতি, মোটা ধান মালাবতী, চাঁপাকুশী প্রভৃতি অসংখ্য নামের বহুরকম ধান সারা বৎসর ধরে ক্রমান্বয়ে চাষ করা হয়। শাল অর্থাৎ শালিধানের নাম শোনা যায় অনেককাল আগে থেকে। বাঙালীর কৃষি-সরঞ্জাম লাঙ্গল, ঢেঁকি, কুলা প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে নাহাল, টুক্‌নঃ, ঢিঙ্কি প্রভৃতি আষ্ট্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত; কৃষিজাত দ্রব্য

আলু, বেগুন, লাউ, লেবু প্রভৃতি শব্দও অষ্ট্রিক শব্দজাত। বাঙলার কৃষিজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে ধানের পরে পাটের স্থান। নানা নামের বিভিন্ন জাতের পাট ও শনের চাষ আদিমকাল থেকে চলে আসছে এদেশে। যখন কার্পাস চাষের প্রচলন হয়নি, তখন থেকে শনবস্ত্র ও পট্টবস্ত্র ছিল এদেশের এক-চেটিয়া ব্যবসায়। কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী ক্ষত্রিয়ধর্মী প্রাচীন জনগোষ্ঠীর লোকেরা সম্ভবত শনসূত্রের উত্তরীয় জাতীয়চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করত, তা থেকে চাতুর্বর্ণ বিভাগকালে শনসূত্রের উপবীতে ক্ষত্রিয়দের অধিকার নির্ধারিত হয়েছিল। তাঁতযন্ত্রের একটি দ্রব্য 'শানা' নামে অভিহিত, উক্ত শানা এবং শানা-পদবী ও শেন-তামিল শ্রেণীনামের উৎস এই শন। শনের চাষ এবং শন, শনসূত্র, শনবস্ত্রের ব্যবসা প্রভৃতি ছিল এদের জীবিকা। পট্ট, বট্ট, ভট্ট, পুট প্রভৃতি শব্দের উৎস পাট। পট্টবস্ত্র এবং পাট ও শনের দড়ি, চট, থলে প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুতের কাজেও অনেকে নিযুক্ত থাকত। পাটের অনেক পরে কার্পাসের চাষ এদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। অতিসূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্রের জন্য প্রাচীন গঙ্গাভূমি বা গঙ্গারিডি জনপদের সুখ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল, এখানকার 'গাঙ্গেরী' 'গঙ্গাজলি,' মেঘ-উডুম্বর, সিলহটি, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি নামের সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র সারা পৃথিবীর বিস্ময়, ইংরাজীতে গাঙ্গেয়-'মসলিন' নামটিও একদা বিখ্যাত ছিল। রোম, মিশর প্রভৃতি দেশে এর চাহিদা ছিল প্রচুর। অর্থশাস্ত্র, 'পেরিপ্লাস'-গ্রন্থ এবং উত্তরকালের চীন, আরব ও ইতালীয় গ্রন্থাদিতে বাঙলার সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্রের উল্লেখ মেলে। ইংরাজ আমলে ঢাকাই-মসলিনের সুখ্যাতিও সুপ্রচারিত ছিল।

খ্রীষ্টজন্মের তিন-চারশ বছর আগে থেকে বঙ্গ ও মগধের রেশমবস্ত্রের সুখ্যাতির কথা জানা যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে। এখানকার সর্বোত্তম রেশমবস্ত্রের নাম ছিল 'পত্রোর্ণ' বা পাতার-পশম। রেশমের চাষ এবং বস্ত্রবয়ন ও বাণিজ্য এদেশের অন্যতম জীবিকা হিসাবে গৃহীত হয়ে এসেছে। এখানকার আর একটি প্রাচীন কৃষিজাত দ্রব্য আখ। পুণ্ড্রবর্ধনের একপ্রকার বিখ্যাত আখের নাম 'পৌণ্ড্রিক', চলতি কথায় যাকে বলে 'পুঁড়ি' আখ। উত্তরবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ 'পুঁড়ো' নামে অভিহিত; আখ, রেশম ও সব্‌জির চাষ তাদের প্রধান জীবিকা। উত্তরবঙ্গের 'পলীয়' নামক প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নামটিও 'পৌণ্ড্রীয়' শব্দের অপভ্রংশ, এরাও প্রধানত কৃষিজীবি। প্রচুর আখের চাষ থেকে এদেশে অপর্যাপ্ত গুড় উৎপন্ন হয়। তাই একদা এদেশের নাম হয়েছিল 'গৌড়'। ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিশেষে বাংলা-পদবী 'গুড়ে' বা 'গুড়িয়া' ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এক কালে।

বাংলার অসংখ্য মানুষ গুড়ের কারবারকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে প্রাচীনকাল থেকে। গ্রীক লেখক ইলিযাস ও লুকেন খ্রীষ্টপূর্বকালে এদেশের গুড় রপ্তানির কথা উল্লেখ করেছেন। নারকেল চাষও এ অঞ্চলে ব্যাপক; নারকেল থেকে নানাবিধ মিষ্টান্ন, নারকেল-তেল এবং ছোবড়া থেকে দড়ি, কাছি, পাপোষ, গদি প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। সুপারীও এখানকার একটি বিশেষ ফসল। তিল ও সরষের চাষ এবং তিলতেল ও সরষেরতেলের ব্যবহার এ অঞ্চলে চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। পিঁয়াজ, রসুন, আদা, লঙ্কা, তেজপাতা, দারুচিনি, লবঙ্গ, ধনে, জিরে, চন্দনী, মৌরী প্রভৃতি মসলা ও তামাকের চাষও এখানে ব্যাপক। পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণে এবং উত্তরকালে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' আমরা এ অঞ্চলের নানারূপ মসলার উল্লেখ পাই। রোমে বাঙলার লঙ্কা একসেরের দাম ছিল ত্রিশ স্বর্ণ-দীনার। বাঙলার রন্ধন-প্রণালীতে নানাবিধ মসলার ব্যবহার চলে আসছে মান্ধাতা কাল থেকে। প্রাচীন বিবরণে খেজুর, কলা, ডালিম, মহুয়া প্রভৃতি ফলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদেশে পাকুড় (পর্কটী) গাছ ও বটগাছ প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত। এ ছাড়া আম, জাম, কাঁটাল, ডুমুর, তেঁতুল, আমলকী, তাল প্রভৃতি তো আছেই। গৃহাদি নির্মাণ ও আসবাবপত্রাদির জন্য শাল, সেগুন, অর্জুন, শিরিশ, বাবলা, গরাণ, সুন্দরী, হেঁতাল, বাঁশ প্রভৃতি কাঠ বাঙলার অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করতে সহায়ক হয়েছে। অস্ট্রিক যুগ থেকে সারা বাঙলা জুড়ে ছিল পানের চাষ; পানের ক্ষেতকে বলা হয় 'বরজ', এই শব্দটিও অস্ট্রিক-শব্দ।

নগর-সভ্যতার বিকাশকাল তাম্রাশ্ম যুগে তাম্রলিপ্ত, তামাজুড়ি প্রভৃতি স্থানের তাম্রখনি থেকে প্রচুর তামা সারা বিশ্বে রপ্তানি হয়েছে। পূর্ব-ভারতের আদিবন্দর তাম্রলিপ্ত মহানগর ছিল তামা রপ্তানি ও নৌবানিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। প্রাচীনকালে এখানকার কোন জনগোষ্ঠী হয়ত দক্ষিণভারতে উপনিবিষ্ট হয়েছিল; 'তামলিপ্তি' থেকে 'তামিল' ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব হতে পারে। রাঢ় অঞ্চলে প্রচুর তামা ও লোহার বহু খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তামা ও লোহা দ্রবীভূত করার কাজ থেকে হয়ত 'দ্রবিড়' বা দ্রাবিড়-শব্দের উদ্ভব হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে তামা ও লোহা রপ্তানি বাঙলার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল। এছাড়া সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি রপ্তানির উল্লেখও আমরা প্রাচীন বিবরণে পাই। গঙ্গা-বন্দর থেকে সোনা, মুক্তা,

প্রবাল প্রভৃতি রপ্তানির কথা পেরিপ্লাস-গ্রন্থে আছে; এ অঞ্চলে স্বর্ণখনি ও স্বর্ণমুদ্রার কথাও আমরা ঐ গ্রন্থে পাই। অর্থশাস্ত্রেও এ অঞ্চলের স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা ও হীরকের উল্লেখ আছে। মহাভারতে আছে যে, রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে মহাবীর ভীমসেন নিম্নবঙ্গের উপসাগর কূলবর্তী লৌহিত্য দেশে উপস্থিত হয়ে জলপ্রধান দেশবাসীদিগকে "বিবিধ রত্ন ও চন্দন, অগুরুবস্ত্র, কম্বল, মণি, মুক্তা, কাঞ্চন, রজত, বিদ্রুম প্রভৃতি মহামূল্য বস্তুজাত" করপ্রদানে বাধ্য করেছিলেন। তারা তাঁকে "কোটি কোটি সংখ্যক সুবিপুল ধনবর্ষণ দ্বারা" আচ্ছাদিত করেছিল; সেই সমস্ত ধন তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অর্পণ করেছিলেন। এত বেশী ধনরত্ন আহরণ থেকে ঐ সময়ে এ অঞ্চলের অর্থ নৈতিক প্রাচুর্যের পরিচয় মেলে। ভীমের উপর পূর্বভারত দিগ্বিজয়ের ভার অর্পিত হয়েছিল; তিনি বিদেহ, কিরাতরাজ্য, মগধ, গিরিব্রজ, অঙ্গ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকী-কচ্ছ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম ও লৌহিত্যদেশ জয় করেছিলেন। ইতিহাসের হিসাবে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৮অব্দ, অর্থাৎ তাম্রাশ্ম যুগ। মহাভারতকারের মতে যেমন সে সময়ে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, তেমন আমরা 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকেও উত্তরকালে এ অঞ্চলের প্রাচুর্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাই— "অতঃপর যেতে হবে পূর্বদিকে, ডাইনে সমুদ্র এবং বাঁয়ে উপকূল রেখে জাহাজ চালালে পড়বে 'গঙ্গা' নামক জনপদ। এখানেই ভারতের বৃহত্তম গঙ্গানদী সাগরে পড়েছে; এই নদীর তীরে একটা 'হাটশহর' বা গঞ্জ আছে, যার নাম 'গঙ্গে'। এখানে ব্যাপকভাবে কেনাকাটা চলে—তেজপাতা, সুগন্ধি গাঙ্গেয় অঙ্গনতৈল, প্রবাল, মুক্তা এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টজাতের গাঙ্গেয়-মসলিন; শোনা যায় এখানে সোনার খনি আছে, এখানকার স্বর্ণমুদ্রার নাম ক্যাল্টস্।" মোহনা-অঞ্চলে গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠীর মূল-বাসভূমি পেরিপ্লাস-বর্ণিত এই 'গঙ্গা-জনপদ,' টলেমির বর্ণনায় সমস্ত গাঙ্গোপদ্বীপ জুড়ে 'গঙ্গারিডি' নামে তাদের নিজস্ব-রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়; এই এলাকা একদা অতুলনীয় প্রাচুর্যে ভরে উঠেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব যুগে শৌর্যবীর্যে সমুন্নত বৃহত্তর গাঙ্গেয় মহাজাতির উত্থান-কালকে আমরা বৃহদ্বঙ্গের গৌরবময় যুগ বলতে পারি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন গঙ্গারিডিদের শৌর্যবীর্যের কথা ভার্জিল, ভ্যালেরিয়াস ফ্লাকাস প্রমুখ রোমদেশের মহাকবিগণ তাঁদের অমর লেখনীতে বর্ণনা করে গেছেন। বিদেশী লেখকগণ বৃহত্তর গঙ্গারিডির হস্তীসম্পদের সপ্রশংস উল্লেখ

করেছেন। মহাভারতেও এদের গজযুদ্ধনিপুণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—"প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ। অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মাগধা-স্তাম্রলিপ্তকাঃ॥ গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহভারত।" বিদেশী ঐতিহাসিকগণের মতে—সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে এদেশে কৃষকরা ছিল প্রথম, আর যুদ্ধব্যবসায়ী সৈনিকরা ছিল দ্বিতীয় স্থানাধিকারী; তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থানুসারে কৃষিকর্মের উপর কেউ কোন অবস্থাতেই ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারতনা—এমন কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধকালেও কৃষকরা শস্যক্ষেত্রে নিরুদ্বিগ্নভাবে কাজ করত। শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শিকার-জীবীর সংখ্যাও কম ছিলনা। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে লবণ উৎপাদন ও লবণ ব্যবসায় অনেকের জীবিকা ছিল। নদীনালা ও খালবিল অধ্যুষিত বঙ্গদেশের অসংখ্য মানুষ প্রাচীনকাল থেকে স্বাভাবিকভাবেই মৎস্যজীবী ও নৌজীবী; নৌযুদ্ধেও বাঙালীরা ছিল পারদর্শী। আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের তটভূমি থেকে বর্তমান সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল 'আঙ্গিরীয়' নামে এক মহাঅরণ্য; দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি নামে ভারতে যে তেরটি মহাঅরণ্য ছিল, এই আঙ্গিরীয়-অরণ্য ছিল তার অন্যতম। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে এবং পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলেও আবহমানকাল বনভূমি আছে। কাঠ, মধু, মোম, নানা পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রচুর বনজ সম্পদ প্রাচীনকাল থেকে বৃহত্তর গঙ্গাভূমির অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করে আসছে। গবেষক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয় ইতঃপূর্বে 'গঙ্গারিডি গবেষনাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকায়' অক্টোবর,১৯৮৭ সংখ্যায় 'সাগর-দ্বীপ' নিবন্ধে (পৃঃ ১০০) আঙ্গিরীয়বনের সবিশেষ উল্লেখ করেছেন।

মাংসের জন্য বন্যপশুপক্ষী শিকার ও ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি প্রতিপালন এবং ডিমের জন্য হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন কৃষিজীবী পরিবার-সমূহে চলে আসছে আদিমকাল থেকে; গরু, মহিষ, গাধা, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি এখানকার অত্যাবশ্যকীয় ও মূল্যবান সম্পদ। রথ, শকট, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহনের উৎপাদন সুরু হয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। ফলে, শিল্পী ও কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এদেশে অনেককাল আগে। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে সমুদ্রবাণিজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল তাম্রলিপ্ত, গঙ্গে প্রভৃতি বন্দরে। শতমুখীগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী প্রভৃতি নদনদীর পথ ধরে ময়ূরপঙ্খী, মধুকর, সপ্তডিঙা প্রভৃতি নামের কত বাণিজ্যপোত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে কতকাল ধরে, বিদেশী জাহাজের আনাগোনায় অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ও বৈদেশিক সংস্কৃতির বিনিময় ঘটেছে স্বদেশে বিদেশে।

সর্বপ্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণাংশ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' এ অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসীদের মধ্যে পুণ্ড্রগণের নাম প্রথম পাওয়া যায়। অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মূতিব প্রমুখ বিশ্বামিত্র-বংশীয় আর্যসন্তানদিগকে ব্রাহ্মণবিরোধী 'দস্যু' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। রামায়ণের যুগে পুণ্ড্রগণের বাসস্থান দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী তীরে এবং এ অঞ্চলে অঙ্গ, মগধ ও মহাগ্রামের সন্নিকটে নির্দিষ্ট হয়েছে। তারপর যাদের কথা জানা যায় তারা হল 'ঐতরেয় আরণ্যকের' বঙ্গ, বগধ (মগধ), চেরপাদ প্রভৃতি পক্ষীজাতি। বঙ্গজাতির বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের বিক্রমপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও আসাম অঞ্চলে। মগধগণের বাসস্থান অঙ্গদেশে। রামায়ণে মগধ ও পুণ্ড্রের সন্নিকটে অঙ্গদেশের অবস্থানক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছে। মহাভারতে অঙ্গদেশকে হস্তিনাপুরের অধীনস্থ করদরাজ্যরূপে দেখতে পাই। মহাভারতে কলিঙ্গদেশ ও জাতি এবং সুহ্মদেশ ও 'সুহ্মও প্রসুহ্ম' জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুহ্মদেশের রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত; রাজধানীর নাম থেকে তাম্রলিপ্ত একদা দেশ ও জাতি-নামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রামায়ণী যুগ থেকেই আমরা অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি জাতির নাম ও তাদের বাসস্থানের উল্লেখ পাচ্ছি। তারপর, উত্তরকালে মহাভারতীয় যুগ ও পৌরাণিক যুগের বিবরণে আমরা বলিরাজার উপাখ্যানে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে তাঁর পাঁচজন পুত্রের বিবরণ জানতে পারি; তাঁদের উদ্ভবকাল রামায়ণী যুগের পরবর্তী সময়ে। সুতরাং বলিরাজার পুত্রগণের জন্মের আগে থেকে কৌমজনপদ হিসাবে উক্ত স্থানগুলির অস্তিত্ব ছিল, বলিপুত্রগণের নামকরণ হয় উক্ত জনপদগুলির নামানুসারে; তাঁরাই নিজ নিজ নামের উক্ত কৌমজনপদগুলিকে কেন্দ্র করে মহাভারতীয় যুগে পাঁচটি দেশ ও জাতি (Nation) গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। চাতুর্বর্ণ সংস্থাপক হিসাবে তাঁদের নামও উল্লিখিত হয়েছে। বৃহদ্বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে প্রাচীনতম গোষ্ঠীনাম অনুসারে উক্ত পাঁচটি জাতির নাম অপরিহার্য। ঐ যুগেই আমরা উক্ত দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত তাম্রলিপ্ত, কর্বট, লৌহিত্য প্রভৃতি রাজ্য ও জাতিসমূহের উল্লেখ মহাভারতে ও পুরাণসমূহে পাই। কিন্তু রামায়ণে পুণ্ড্রদেশের দক্ষিণে জনবসতিহীন রসাতল বা পাতালপ্রদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে; এই নির্জন দ্বীপের ভূগর্ভস্থ আশ্রমে সাঙ্খ্যদর্শনপ্রবক্তা কপিলমুনি সাধনা করতেন। তৎপরবর্তীকালে মহাভারতীয় যুগে উক্ত গাঙ্গোপদ্বীপ অঞ্চলকে আমরা মহা ঐশ্বর্যশালী ম্লেচ্ছজাতীয় নরপতিগণের রাজ্যরূপে দেখতে পাই। আঙ্গিরীয় মহাঅরণ্য অধ্যুষিত ব্রাহ্মণবিহীন এলাকায়

ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকলাপবর্জিত জাতিগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে 'ম্লেচ্ছ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

'পুণ্ড্র' সংস্কৃত-শব্দ, পূর্বীপ্রাকৃত ভাষায় শব্দটি ছিল 'পুড্' ; বর্তমান বাংলাদেশের করতোয়া নদীতীরে বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাগ্বৈদিক যুগে স্থাপিত হয়েছিল 'পুড্নগল' (সংস্কৃতে 'পুণ্ড্র নগর')। রামায়ণে উল্লিখিত 'মহাগ্রাম'ই সম্ভবত বর্তমানে 'মহাস্থান' গ্রামনাম হিসাবে পরিগণিত। বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এই মহাস্থান-গড়ে। পূর্বীপ্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা উক্ত শিলালিপি মহারাজ অশোকের অনুশাসনের লিপিছাঁদে ক্ষোদিত ; সুতরাং উক্ত লিপি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। তৎকালীন বঙ্গদেশের ভাষাতাত্ত্বিক, ধর্মভিত্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—এক কথায় আর্থসামাজিক পটভূমি পর্যালোচনায় এই উপকরণটির গুরুত্ব সবাধিক। ভারতের দূর দূরান্ত অঞ্চলে মহারাজ অশোক তাঁর নির্দেশনামাযুক্ত শিলালিপি ও স্তম্ভ প্রভৃতি স্থাপন করে গেছেন ; কিন্তু পাটলিপুত্রের এত নিকটবর্তী পুণ্ড্রবর্ধনে তাঁর কোন নির্দেশনামা বা স্তম্ভ পাওয়া যায়নি ; এ থেকে বোঝা যায় যে, পুণ্ড্রবর্ধন তখন মৌর্যসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল না। অশোকের কলিঙ্গবিজয়ের কথা জানা যায়, কিন্তু সামসাময়িকালের কোন প্রাচীন লেখ বা গ্রন্থে মৌর্যসম্রাটগণের পুণ্ড্রবর্ধন-বিজয়ের কথা জানা যায় না। যাহোক, পূর্বীপ্রাকৃতে লেখা মহাস্থান-শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এদেশে আর্যভাষা প্রচলিত ছিল। শিলালিপিটিতে লেখা আছে—

> " নেন [।] স [ ] বগিব [া] নং [তল দিন স] সম দিন। [সু]
> [ম] া তে। সুলখিতে পুডনগলতে। এ [ত] ং
> [নি] বহিপয়িসতি। সংবগিযানং [চ] [দি] নে ★★
> [ধা] নিয়ং। নিবহিসতি। দগ-তিযা [ি] য়কে ★★
> ★★★ [যি] কসি। সুঅ-তিয়ায়িক [সি] পি। গংড [কেহি]
> ★★★ [য়ি] কেহি এস কোঠাগালে কোসং ★★★
> ★★★★"

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারকৃত উপরিউক্ত পাঠোদ্ধারের [বন্ধনী-মধ্যস্থ অক্ষরগুলি শিলালিপির অস্পষ্টতার জন্ম অনুমিত] নিম্নরূপ বাংলা অর্থ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন—

> "…ধান্যসংগ্রহকারীদের দেওয়া নিয়ে যাওয়ার (ধান) সব দেওয়া হল। সুমাত্র সমৃদ্ধ পুণ্ড্রনগর থেকে এই

ডেলিভারি দেবে। সংগ্রহকারীদের দেওয়া
ধান নিয়ে যাওয়া হবে। সীমান্তঘাঁটিতে হাঙ্গাম (হলে) দৈবদুর্বিপাক
হলে, নিজেদের মধ্যে হাঙ্গাম হলেও নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ
…দিয়ে এই কোষ্ঠাগার (অথবা কোষ্ঠাগারে) কোশ…
(পূরিয়ে দিতে হবে).. …"

এই শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, সেকালে এদেশে গোষ্ঠী-শাসনব্যবস্থায় সমবায় প্রথার প্রচলন ছিল ; সমবায় ভাণ্ডারে জমা ধান দুর্ভিক্ষাদি আপৎকালে সকলে কর্জ নিত এবং যথাসময়ে নির্দিষ্ট হারে পরিশোধ করত। মড়বর্গীয় বৌদ্ধ মহামাত্র বা শ্রমণগণ এই ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন ; সুতরাং রাজতন্ত্রের কোন আভাস এখানে মেলেনা। তা যদি হত, তাহলে রাজকোষ থেকে এই সাহাযাদানের রাজকীয় নির্দেশনামা রাজকর্মচারীদের প্রতি জারি করা হত ; বৌদ্ধ শ্রমণদের ধর্মগোলা থেকে সাহায্য দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো রাজশক্তির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মেগাস্থিনিস লিখেছিলেন যে, এদেশে দুর্ভিক্ষ হয়না ; কিন্তু এই শিলালিপি থেকে মেগাস্থিনিসের পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ মেলে। পুণ্ড্রনগর তখনও সুসমৃদ্ধ ছিল, সে আভাসও পাওয়া যায় এই শিলালিপি থেকে। আরও বোঝা যায় যে, প্রাচীন 'পুড্' শব্দ থেকে সংস্কৃত 'পুণ্ড্র' নামের উদ্ভব।

২

'পুড্' থেকেই 'পুদ্' এবং 'পুদ' থেকে 'পোদ' নামক জাতিবাচক শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র। আবার সংস্কৃত 'পুণ্ড্র' শব্দ থেকে 'পুঁড়' এবং পুঁড থেকে 'পুঁড়ো' নামক জাতিবাচক শব্দের উৎপত্তি। জাতিবাচক 'পলীয়' শব্দটিও 'পৌণ্ড্রীয়'-শব্দের অপভ্রংশ ; সুতরাং এরা সকলেই সেই প্রাচীন পৌণ্ড্র-কৌমের বংশধর। অতএব বর্তমানকালে বাঙালী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণের এই তিনটি শাখাই বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রবর্ণিত পুণ্ড্রগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ। সমাজ বিবর্তনের ফলে তাদের অনেকে আবার ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। পুণ্ড্রনগরকে কেন্দ্র করে একদা বরেন্দ্র ও রাঢ়ের বিরাট এলাকা জুড়ে যে পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য বিস্তারলাভ করেছিল এবং বিশাল পুণ্ড্র জাতির (Nation) অভ্যুত্থান হয়েছিল, তাদের বংশধররা হল বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, সদ্গোপ প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষত্রিয়ধর্মী প্রাচীন জনগোষ্ঠী ও কোলজাতীয় আদিবাসীগণ। এদের পূর্বপুরুষরা সবাই ছিল

সেই বিশাল পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী। সে হিসাবে পৌণ্ড্র জাতি (Nation) বলতে কেবলমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নয়, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের অসংখ্য প্রাচীন সম্প্রদায়গুলিও সেই পৌণ্ড্র জাতির বংশধর এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ প্রাচীনতর পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর (Race) বংশধর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, "ভাগীরথীতীর অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্মের যে নিচ্ছিদ্র প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার বহির্ভাগেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের এই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া ইহারা সাংস্কৃতিক বিষয়েও নিজস্ব ধারাটি অনুসরণ করিবার অনেকখানি সুযোগ পাইয়াছে।" মহাভারতীয় যুগে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বঙ্গ ও কিরাত রাজ্যকে পুণ্ড্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং মধ্যভারতে বারানসী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন; তিনি সম্রাট জরাসন্ধের পক্ষপুষ্ট ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে একলব্য, নরক, জরাসন্ধ প্রমুখের সহযোগে দুর্দম পৌণ্ড্রগণের কৌরবপক্ষে যোগদানের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বারকানগর অবরোধের কথা বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে ও মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণগুলিকে নিছক কল্প-কাহিনী হিসাবে মনে না করে, তা থেকে আমরা জাতিতত্ত্ব সম্পর্কীয় গ্রহণযোগ্য বিবরণ ও ইতিহাসের উপকরণগুলি আহরণ করতে পারি এবং সেই হিসাবেই আমরা দেখতে পাই বাসুদেব-পুণ্ড্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও দেবতা পূজা নিষিদ্ধ করেছিলেন; অর্থাৎ পৌণ্ড্রদেশের প্রাচীন ক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী বর্ণবৈষম্য ও দৈববাদের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে, যাগযজ্ঞ নিষিদ্ধ করে, কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং গঠনমূলক কাজে মনোযোগ দিয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন নূতন কৃষ্টি, যে কৃষ্টি উত্তরকালে বৃহত্তর গঙ্গাভূমিতে বৈদিক আর্যগণের অগ্রগমন প্রতিহত করেছিল।

বর্তমান ঐতিহাসিকগণের মতে, পুণ্ড্রদেশের পশ্চিমে ছিল অঙ্গ বা ভাগলপুর এবং পূর্বে বঙ্গ (ঢাকা ও ময়মনসিংহ)। উত্তরে দিনাজপুরের কতকাংশ এবং মালদহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কতকাংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল পুণ্ড্রদেশ। ঐতিহাসিক উইলসন সাহেবের মতে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুরের কতকাংশ, রামগড়, পালামৌ, পচেটের জঙ্গলময় স্থান ও চুনারের কতকাংশ এবং জেনারেল কানিংহামের মতে পাবনা জেলাও পুণ্ড্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ভবিষ্য পুরাণের মতে পুণ্ড্রদেশ সাতভাগে বিভক্ত—গৌড়, বরেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি, বর্ধমান, নারীখণ্ড ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। উত্তরকালে পুণ্ড্রবর্ধনরাজ্য একদা বঙ্গোপসাগরকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পুণ্ড্রদেশের

রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ; করতোয়া তীরের পুণ্ড্রনগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই রাজধানী-শহর। তারপর রাজধানীর নাম থেকে রাজ্যের নামও হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধন। পৌণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাসই বাঙ্গালার ইতিহাসের আদিকাণ্ড ; ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ তাঁর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্ধন ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস বিশেষরূপে আলোচনা করেছেন। পৌণ্ড্রদেশের বিশাল এলাকার অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল এক মহাজাতি ; তাদের ভাষা ছিল প্রাচীন আর্যভাষা। মহাস্থান-শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বসবাস ছিল।

জৈন ও বৌদ্ধরা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী। এদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের মত তারা ছিল ক্ষত্রিয়ত্ববাদী। মহাভারতে ও মনুস্মৃতিতে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, যবন, কিরাত, পুণ্ড্র, কলিঙ্গী, মাহিষক প্রভৃতি জাতিকে প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতিরূপে গণ্য করা হয়েছে সে কথা আগেই আলোচনা করেছি। ব্রাহ্মণজাতির বিধানবহির্ভূত বলে তারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে ব্রাহ্মণশাস্ত্রকারগণ মন্তব্য করেছেন। ব্রাহ্মণ্য জাতিতত্ত্বের বিধান পরিহার করলেও ক্ষত্রিয়স্বভাবের লোকেরা কর্মবীর হিসাবে নিজ নিজ গুণানুসারে ক্ষত্রিয়ই। বুদ্ধদেব জাতিগত বৃষলত্ব ও জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব প্রথা মানতেন না, তিনি বলতেন মানুষ কর্মের দ্বারা বৃষল হয় এবং কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়—"ন জচ্চা বসলো হোতি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো। কম্মুনা বসলো হোতি কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো ॥" —(ধম্মপদ, ব্রাহ্মণো বগ্‌গো)। বৌদ্ধসূত্র 'সংযুক্তনিকায়' আছে—"খত্তিয়ো সেট্‌ঠো জনে তস্মিন যে গোত্তপটিসারিণো। বিজ্জাচরণসম্পন্নো সো সেট্‌ঠো দেব মানুষে।" অর্থাৎ, 'ক্ষত্রিয়' জনসমাজে শ্রেষ্ঠ, সেজন্য সে-বংশে জন্মলাভ ক'রে যে বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন, সে ব্যক্তি দেবতা ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'জিন-সংহিতায়' প্রথমে ক্ষত্রিয় এবং পরে ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। 'বৃহদারণ্যকে'ও আছে যে, ক্ষত্রিয়ের পর আর নেই, সেজন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রাজার অধীনস্থ থাকবে—"তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি অস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ম্ অধস্তৎ উপাস্তা।" মহাস্থান শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, সে সময় পৌণ্ড্রবর্ধনের জনপদগুলি বৌদ্ধ সঙ্ঘের দ্বারা পরিচালিত হত। প্রাচীন বাঙলার অধিবাসীরা ছিল ক্ষত্রিয়ত্ববাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী ; ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে আর্যাবর্ত থেকে হঠে আসা যৌধেয়জনগোষ্ঠী এই বাঙলামুলুকে এবং দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের সঙ্গে সমবেতভাবে দুর্ভেদ্য আশ্রয়স্থল রচনা করেছিল। শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেই লাগাতর লড়াইয়ের কাহিনী নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে।

যদুবংশীয় কার্তবীর্যার্জুন কর্তৃক জমদগ্নি ঋষির আশ্রম ধ্বংস ও হোমধেনু-বৎস লুণ্ঠনের ফলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে প্রবল সংঘর্ষ বাধে। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয়বীর কার্তবীর্যার্জুনকে নিহত করেন; কিন্তু তাঁর পুত্রগণ পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে হত্যা করায়, তিনি প্রবল ক্ষত্রিয়-বিদ্বেষীরূপে একুশবার যুদ্ধ পরিচালনা দ্বারা ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন। এইভাবে ব্রাহ্মণকুলের শৌর্যপ্রদর্শক ও গৌরবরক্ষাকারী হিসাবে শাস্ত্রে ইনি ভগবানের অবতাররূপে বর্ণিত হন। প্রবল পরাক্রান্ত পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয়গণের বহু গোষ্ঠী উপবীত ও আয়ুধাদি ক্ষত্রিয়চিহ্ন পরিত্যাগ করে আত্মগোপনে বাধ্য হয়। মহাভারতে এই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে; আবার ব্রাত্যসংস্কার দ্বারা উত্তরকালে ক্ষত্রিয়ত্বে প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ ও বিধানের কথাও মহাভারতে আছে। হরিবংশে এবং 'সুভৌম চরিত' নামক জৈনশাস্ত্রে কার্তবীর্যার্জুনের বংশধর ক্ষত্রিয়বীর সুভৌম কর্তৃক অতঃপর একুশবার সমগ্র ব্রাহ্মণকুল ধ্বংসের বিবরণও পাওয়া যায়। বিপুলভাবে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ধ্বংসের ফলে সংখ্যাল্পতার জন্য (অল্পার্থে 'নঙ' যোগে) 'নিঃক্ষত্রিয়' ও 'নির্ব্রাহ্মণ' শব্দ উভয়ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। মহাভারত-পুরাণাদিতে বর্ণিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই দ্বন্দ্ব চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। প্রাচীন ক্ষত্রিয়-পুণ্ড্ররা সেই লড়াইয়ে হীনবল হয়ে পড়েছিল এবং তারপর বিদেশী আক্রমণে পিছু হঠতে হঠতে এই গাঙ্গোপদ্বীপে মোহনা অঞ্চলের জঙ্গলময় বদ্বীপসমূহে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। একদা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করে সমগ্র বৃহদ্বঙ্গে অর্থাৎ পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রাচীন ক্ষত্রিয়পন্থী-দের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈন ও বৌদ্ধরা ক্ষত্রিয়ত্ববাদী হওয়ায় ঐ দুটি ধর্মই এ অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। মধ্যযুগ পর্যন্ত রাঢ়-বরেন্দ্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বৈষম্যহীন বৌদ্ধ ধারা যে অব্যাহত ছিল, তা 'রাঢ়ী-বারেন্দ্র দোষকারিকা' নামক কুলগ্রন্থ থেকে জানা যায়—"এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস। বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করল সর্বনাশ॥ পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি। কর্ম খাইয়া ধর্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥"

জাতীয় চিহ্ন হিসাবে শনসূত্রের উপবীতে অধিকারী ক্ষত্রিয়গণ কার্পাস-সূত্রের উপবীতে অধিকারী ব্রাহ্মণগণের পূর্ববর্তী কিনা ভেবে দেখার অবকাশ আছে। যূথপতিকে কেন্দ্র করে আদিম মানুষ সমাজবদ্ধ হতে শিখেছিল এবং ভূম্যধিকারী শাসকগণই ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত। তখন ছিল 'জোর

যার মুলুক তার,' 'যার লাঠি তার মাটি'—অরণ্যের আইন। শারীরিক বল ও মানসিক দৃঢ়তা যে ব্যক্তি বা সমাজের যত বেশী, সেই ব্যক্তি বা সমাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে প্রাধান্য স্থাপনে ততখানি সক্ষম। তখন ব্রাহ্মণ-শূদ্র, আর্য-অনার্য প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তখনকার মানবসমাজকে দুটিমাত্র ভাগে ভাগ করা যায়—উপরে শাসনকারী অর্থাৎ দলপতি বা রাজা বা ক্ষত্রিয়, আর নীচে বিশ বা জনসাধারণ। পৃথিবীর সকল দেশে সমাজব্যবস্থার আদিতে সর্বপ্রথম এই শ্রেণীবিভাগের উদ্ভব। মানসিক দৃঢ়তাই হল জ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা ; আর দৈহিক শক্তিই কর্মশক্তি। এই জ্ঞান ও কর্ম একযোগে ক্ষত্রিয়ত্ব বা ক্ষাত্রধর্ম। শাস্ত্রেও সত্ত্বঃ ও রজঃ গুণই ক্ষত্রিয়ের লক্ষণরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে ; সুতরাং প্রাচীন ক্ষত্রিগকে কোনমতে ব্রাহ্মণ আখ্যা দেওয়া চলেনা। 'প্রবাসী'র মাঘ, ১৩৫৫-সংখ্যায় 'চারিযুগ' নামক প্রবন্ধে শ্রীবিমলাচরণ দেব মহাশয় এ সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করেছেন।

বাঙলার আদিসমাজ, জাতিভেদের বিবর্তন ও ধর্মসাধনা বিষয়ে ডঃ অতুল সুরের অভিমত থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত আর্যসমাজ থেকে বাঙলার সমাজ সংগঠন সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এই প্রাচ্যদেশে বিভিন্ন বৃত্তিধারী কৌমসমাজে চাতুর্বর্ণ বিভেদ না থাকার জন্য আর্যরা প্রাচ্যদেশবাসীদের ঘৃণা করত। বাঙলার জনপদগুলি পুণ্ড্র, বঙ্গ, কর্বট (বর্তমান কৈবর্ত জাতির পূর্বপুরুষ) প্রভৃতি এক-একটি কৌম-জাতির নামে অভিহিত হত। আর ছিল বাগ্‌দী, হাড়ি, ডোম, বাউড়ী প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষরা। গ্রীকবর্ণনা মতে দক্ষিণরাঢ়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাগ্‌দী ও কৈবর্ত জাতি ‥ । উত্তররাঢ়ে সদ্গোপদের এবং বাঁকুড়া অঞ্চলে মল্লক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে গৃহীত লেখক-বৃত্তিধারী 'করণ' ও উচ্চপদস্থ 'কায়স্থ' তখন জাতিনাম হিসাবে গণ্য হত না, খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী থেকে কায়স্থরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করতে সুরু করেছে, তার আগে মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল (নমঃ-শূদ্র), ডোম, শবর, কাপালী, পুলিন্দ, কক্কস, যবন, খস, সৌম, কম্বোজ, খর প্রভৃতি জাতির নামও পাওয়া যায়। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে আদিম বাঙলায় মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, মানুষ ও প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, লিঙ্গ পূজা, টোটেমের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা; মানুষের ব্যধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্টশক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত

হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক অনুশাসন ইত্যাদি নিয়েই প্রাক-আর্যধর্ম গঠিত ছিল। এই প্রাক্-আর্যভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম। জৈন সাধুরা তাম্‌লিত্তিয় (তাম্রলিপ্তীয়), কোডিবর্ষীয় (কোটিবর্ষীয়), পুণ্ড্রবর্ধনীয়া (পুণ্ড্রবর্ধনীয়) ও খব্বডীয় (কর্বটীয়) নামক চারটি প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিলেন ; অতএব খ্রীষ্টপূর্বযুগে এই বাঙলা মুলুকেই জৈনধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

প্রাচীন বাংলায় আজীবিক ধর্মের প্রাবল্য ছিল ; মহাবীরের একজন বিশেষ বন্ধু এই ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন, তাঁরা উভয়ে একসঙ্গে রাঢ়দেশে ছ'বছর বাস করেছিলেন, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পশ্চিমবাংলায় আজীবিকধর্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছিল। কথিত আছে, মহারাজ অশোক ১৮,০০০ আজীবিক সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করেছিলেন. পৌণ্ড্রবর্ধনের একজন নিগ্রন্থের অপরাধের জন্য। বুদ্ধদেবও ধর্মপ্রচারার্থে পুণ্ড্রবর্ধন দেশে ছ মাস বাস করেছিলেন। গুপ্তযুগকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগ বলা যায় ; তার আগে কিছু ব্রাহ্মণের আগমন ঘটলেও এ অঞ্চলে তারা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি, পরন্তু তারা নিজেরাই এখানকার সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া ছিল তন্ত্রধর্ম ; বক্রেশ্বরের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধু অঘোরীবাবার মতে, "বেদের উৎপত্তির বহু শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্র মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক। অনার্য বলে আর্যরা যাদের ঘৃণা করতেন, সেই দ্রাবিড়দের ভাষাতেই তন্ত্রের যা কিছু ব্যবহার ছিল। পুঁথি-পুস্তক তো ছিলনা, বেদের মতোই লোক পরম্পরায় মুখে মুখে তার প্রচার ছিল। সাধকদের স্মৃতির ভিতরেই তা বদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির নামগন্ধও ছিল না। কারণ তন্ত্রের ব্যবহার যে সব মানুষকে নিয়ে, তার মধ্যে জাত কোথায় ? সাধারণ মানুষের ধর্মকর্ম নিয়েই তো তন্ত্রের সাধন। তন্ত্রের জগতে বা অধিকারে ঘৃণার বস্তু বলে কিছুই নেই। শব সাধন, পঞ্চমুণ্ডি-আসন, মদ্য-মৎস্য-মাংসের ব্যবহার—তন্ত্রের এ সবই তো আর্য-ব্রাহ্মণদের ধারণায় ভ্রষ্টাচার। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণরা যতদিন বাংলায় আসেন নি, ততদিন তাঁদের এভাবের যে একটি ধর্মসাধন আছে আর সেই ধর্মের সাধনপ্রকরণ তাঁদেরই একদল গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আর একটি ধর্ম গড়ে তুলবেন, এ কথা কল্পনায়ও আনতে পারেননি। তারপর তন্ত্রের ধর্ম গ্রহণ ক'রে ক্রমে ক্রমে তাঁরা অনার্যই হয়ে পড়লেন—তাঁদের বৈদিকধর্মের গুমোর আর কি রইল ?" বাঙলাদেশ যখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে প্লাবিত হয়েছিল, তখন থেকে এদেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক উদ্ভব হয়েছিল—লোকনাথ, মৈত্রেয়ী, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি বোধিসত্ত্ব মূর্তি এবং তারা, মারীচি, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি

শক্তিমূর্তি ছিল বৌদ্ধদের। কুবের, সরস্বতী ও গণেশমূর্তি ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয়বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

এ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তিসমূহ থেকে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌরীয় ও বৈষ্ণবধর্মের পরিচয় মেলে ; এ ছাড়া যক্ষ-যক্ষিণী ও নানা প্রকারের প্রাচীন মুণ্ডমূর্তি, প্রস্তরখণ্ড এবং ঘোড়া, হাতী, মেষ, পাখী, সাপ প্রভৃতি টোটেমের নিদর্শনও পাওয়া যাচ্ছে। শিব, কালী, মনসা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পুজার মধ্যে আদিম-সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নানাজাতীয় মাছ ছিল বৌদ্ধ-বাঙালীদেরও প্রিয় খাদ্য। হিউ-এন্-চাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন বাঙলায় চায়ের ব্যবহারও ছিল। কিন্তু বৃহদ্বঙ্গের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ, ডিম, মাংস, দুধ ইত্যাদি। শাকসব্জির মধ্যে ছিল পিড়িং, পলতা, হিঞ্চে, শুষণী, কলমী, পালং, পুঁই, নটে, পাটপাতা, আলু, বেগুন, মূলো, লাউ, কুমড়ো, পটল, ঝিঙে, চালতা, কাঁচকলা, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। নিরামিষভোজী ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্য-নরগোষ্ঠীর মত খাদ্যাখাদ্য বিচার বঙ্গজাতির মধ্যে ছিল না ; তাই সংস্কৃত ভাষাভাষী বৈদিক ব্রাহ্মণের বিচারে বঙ্গজনগোষ্ঠী পক্ষীজাতিরূপে গণ্য হয়েছিল।

ডঃ সুরের মতে "সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশের পূর্বে যে ভাষায় বাঙলাদেশের লোক কথাবার্তা বলত তা অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আল্পীয় নরগোষ্ঠীর ভাষা। এদের মধ্যে আল্পীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরা আর্যভাষাভাষী ছিল। কিন্তু এই আর্যভাষার সঙ্গে বৈদিক আর্যগণের ভাষার কিছু প্রভেদ ছিল। পতঞ্জলি এটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, পূর্বভারতের লোকেরা কতক-গুলি 'ক্রিয়াশব্দ' বিশেষ অর্থে এবং 'র' বর্ণটির পরিবর্তে 'ল' বর্ণ ব্যবহার করে। পতঞ্জলি আরও বলেছিলেন যে, এইরূপ ব্যবহার 'অসুর' জাতির উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'র' স্থানে 'ল'-এর উচ্চারণ মাগধী-প্রাকৃতেরও বৈশিষ্ট্য। এ থেকে মনে হয় যে, বাঙলার আদিভাষা মাগধী-প্রাকৃতেরই অনুরূপ কোন ভাষা ছিল।"

মহাস্থান-শিলালিপিতেও আমরা অনুরূপ ভাষার পরিচয় পাই। কিন্তু বাংলাভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল 'অস্ট্রিক' ভাষাভাষীরা ; ভারতবর্ষ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার-দ্বীপ অর্থাৎ বর্তমান অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এই ভাষার বিস্তৃতি ছিল। নৃতাত্ত্বিক বিচারে অস্ট্রালয়েড বলতে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি 'নিষাদ' জাতির লোকদের বোঝায়। এদের পূর্বপুরুষেরা

ছিল ভারতের আদিম অধিবাসী; একদা দক্ষিণভারত থেকে শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এদের বসতি স্থাপিত হয়েছিল। এদের পরে এসেছিল দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকেরা; তাদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর মিল আছে। আদি-মিশরীয়দের সমতুল্য এই দ্রাবিড়রাই নগরসভ্যতার স্রষ্টা। বর্তমানে দক্ষিণভারতে এদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। দ্রাবিড়দের পর এদেশে আসে ইউরোপের আর্যভাষাভাষী 'আল্পাইন' নরগোষ্ঠী। দ্রাবিড়দের মত এরাও প্রথমে বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেছিল সমুদ্রপথে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এবং ক্রমান্বয়ে একান্তভাবে মিশে গিয়েছিল এখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে। ভারতের এই মিশ্রিত প্রাচীন অধিবাসীরা ম্লেচ্ছ, অসুর এবং 'দেশীয়' অর্থে দস্যু, দাস প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছে উত্তরকালে। প্রাচীন অধিবাসীদের এই বিবর্তন ঘটেছিল হাজার হাজার বছর ধরে। সর্বশেষে, দেড় হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে এদেশে প্রথমে পঞ্চনদের উপত্যকায় প্রবেশ ক'রে বসতিস্থাপন করেছে আর্যভাভাষী 'নর্ডিক' নরগোষ্ঠী; হিন্দুজাতিগোষ্ঠীরূপে প্রথমে এরাই সংকলন করেছিল 'ঋগ্বেদ'। তাই এরা ঋগ্বৈদিক বা বৈদিক আর্য হিসাবে অভিহিত। গুণকর্মানুসারে চাতুর্বর্ণ বিভাগ দ্বারা সকল শ্রেণীর মানুষকে এরা আর্যবর্ণাশ্রমভুক্ত করে নিতে চেয়েছিল; কিন্তু শূদ্রদের রেখেছিল ক্রীতদাস অপেক্ষাও নিকৃষ্ট পর্যায়ে। প্রবল ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অহঙ্কার নিয়ে দেশীয় সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে হানতে তারা স্বধর্মরক্ষার অজুহাতে, বর্বর-আক্রমণে ধ্বংস করেছিল নগরের পর নগর, হত্যা করেছিল আবালবৃদ্ধ বণিতাকে। বাণিজ্যসম্পর্কিত মিত্রতা সূত্রে ভূমধ্যীয় ও আল্পীয়দের মত মিলেমিশে না গিয়ে তারা জোর করে নিজেদের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সংগ্রাম করতে করতে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পূর্বদিকে বিদেহ পর্যন্ত অধিকার ক'রে, প্রতিহত হয়েছিল এই বৃহত্তর বঙ্গের দস্যু, অসুর ও ম্লেচ্ছদের কাছে। দক্ষিণ-ভারতেও তারা অধিকার বিস্তার করতে পারেনি; কিন্তু কালক্রমে হিন্দু-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের সর্বত্রই।

তাম্রাশ্ম যুগে প্রাচীনবংশীয়েরা যে নগর-সভ্যতার পত্তন করেছিল, তা থেকে তাদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগতির ফলে সেই অসুরপন্থীরা ছিল চিন্তাশীল ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। সভ্যতার মাপকাঠিতে, এশিয়ার তৃণভূমি থেকে আগত পশুপালক নর্ডিকেরা ছিল সে তুলনায় অনগ্রসর; তারা ছিল তপোবনকামী নগরবিমুখ দৈববাদী ও নৌবিদ্যায় একেবারে অজ্ঞ। পুর বা

নগর ধ্বংসের দক্ষতা থেকে দেবরাজ ইন্দ্র 'পুরন্দর' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক দাসজাতির একশত সুরম্য নগরের মধ্যে নিরানব্বইটি নগর ধ্বংসের উল্লেখ আছে বেদে ; ঐসব নগরের মধ্যে যজ্ঞাবতী নদীতীরে 'হরিযুপীয়া' সম্ভবত ইরাবতী নদীতীরে 'হরপ্পা'। যেমন, নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংসের পিছনে প্রাকৃতিক কারণ ছিল প্রধান কারণ, কিন্তু অবশেষে পর্তুগীজ বোম্বেটে জলদস্যুরা নিঃশেষ করেছিল সব কিছু ; তেমন, হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর মত প্রাচীন শহরগুলি ধ্বংসের পিছনে প্রাকৃতিক কারণ থাকলেও, সেগুলি নিঃশেষ হওয়ার ব্যাপারে ঋগ্বৈদিক আর্যদের দুর্ধর্ষ আক্রমণও অন্যতম বিশেষ কারণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে অনার্য সভ্যতা ও আর্যসভ্যতার মিশ্রণের ফলে সারা ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়েছে হিন্দু সভ্যতা এবং নানা মত ও নানা পথের স্বীকৃতি নিয়ে যে বিচিত্র মিশ্র-ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তার নাম সনাতনধর্ম বা হিন্দুধর্ম।

পক্ষান্তরে কারো কারো মতে আর্যজাতি থেকেই পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব ; তাঁরা Inner Aryan ও Outer Aryan থিওরি দিয়ে ভারতের জাতিগোষ্ঠীর বিচার করেন। তাঁদের মতে, 'সাগরীয়' (ভূমধ্যসাগর তথা ভারতমহাসাগর) আর্যরা দ্রাবিড়, আল্পস (মধ্য-ইউরোপ) তথা 'পাহাড়ী' আর্যরা আল্পাইন তথা পূর্বভারতীয়, 'সমতলী' আর্যরা নর্ডিক (উত্তর ইউরোপ) তথা পশ্চিমভারতীয় আর্য ; এবং পূর্বভারতীয় ব্রতবাদী বা ব্রাত্য-আর্যদের অথর্ববেদ, দক্ষিণভারতীয় দ্রাবিড় আর্যদের ভজনকীর্তনের জন্য সামবেদ এবং পশ্চিমভারতীয় আর্যদের সাধ্যায়ের জন্য ঋগ্বেদ ; যজুর্বেদ পরবর্তীকালে যজ্ঞের প্রয়োজনে উদ্ভূত। যজ্ঞ অর্থে সমন্বয় অনুষ্ঠান ; প্রথম সমন্বয়ের বেদ কৃষ্ণ-যজুর্বেদ, পরবর্তী সমন্বয়ের বেদ শুক্ল-যজুর্বেদ, এজন্য যজুর্বেদ দ্বিবিধ। লোকশ্রুতি বা লোক-সাহিত্য অর্থাৎ পরিবেশের লোকাচার থেকে চারি বেদ বা শ্রুতির উদ্ভব। ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রথমে ত্রয়ীশ্রুতি 'ঋক-সাম-যজুঃ' যথাক্রমে সংকলিত হওয়ায় এবং ভাষাগত সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বিত হওয়ায় ত্রয়ীশ্রুতির প্রাচীন ভাষা অবিকৃত আছে ; কিন্তু তাদের উৎসস্থানীয় অথর্ববেদ আরো দীর্ঘকাল লোকশ্রুতি বা ব্রতগুলিকে আশ্রয় করে চলতে থাকায়, স্বাভাবিক ভাবেই ভাষাগত পরিমার্জনা ঘটেছে, তাই 'অথর্ব' অর্থাৎ 'আদিম' বেদ হওয়া সত্বেও সর্বশেষে সংকলিত হওয়ায় অথর্ববেদের ভাষা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ঋষি-পুরোহিতগণ

বেদবাণীর সংকলক ছিলেন, রচয়িতা ছিলেন না, তাই বেদকে বলা হয়েছে 'অপৌরুষেয়।' লোকশ্রুতি থেকে ভাব গ্রহণ করে, সূক্ত রচনা অর্থাৎ সংস্কৃত শ্লোকে রূপান্তর ঘটানোই ছিল ঋষি-ব্রাহ্মণগণের কাজ, এজন্য তাঁরা সাধারণের নিকট বেদ-সূক্তের রচয়িতা হিসাবে পরিগণিত। ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রকারগণ উত্তরকালে বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করে অব্রাহ্মণ্যবাদীগণের প্রতিকূলে ব্যবহার করেন।

প্রকৃতপক্ষে বেদবাণীর উপাদান সৃষ্টি হয়েছে আদিম যুগ থেকে আদিম ভাষায়। রচয়িতার নাম জানা যায় না, যুগ যুগান্ত ধরে এগুলি শুধু শ্রুত হয়ে আসছে. তাই বেদকে বলা হয় 'শ্রুতি'। বিদ্-ধাতু থেকে 'বেদ' শব্দের উৎপত্তি, 'বিদ্' মানে জানা অর্থাৎ জ্ঞান। আদিম যুগ থেকে মানুষ যখনই কোন নূতন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করেছে, তখনই তা সুরে তালে ছন্দে গেঁথে সকলের নিকট পৌছে দিয়েছে। এইভাবে লোকগাথা থেকে লোকগীতি ও লোকসাহিত্যের সৃষ্টি, এবং তা থেকে দরবারী সঙ্গীত, সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যে রূপান্তর। প্রাচীন যুগের বৈদিক সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। বংশপরম্পরায় শ্রুত কাহিনী এবং ভ্রমণকালে দেখা বা শোনা বিভিন্ন স্থানের বিশেষ ঘটনা প্রভৃতি থেকে জানা (বিদ্) বিষয়ে গাথা রচনা করে দলবদ্ধভাবে দেশে দেশে শুনিয়ে বেড়ানোর পেশা থেকে 'বেদে,' 'বেদুইন' প্রভৃতি নামের উৎপত্তি হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে, ঐসব যাযাবর সম্প্রদায় এক এক এলাকার অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলি অন্যান্য এলাকায় শুনিয়ে বেড়াত—এভাবে দেশে দেশে সর্বজাতির নিকট প্রচারিত হত বেদবাণীর উপাদানগুলি, এর মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, জল, বাতাস প্রভৃতির অধিষ্ঠাতাগণের বিষয় এবং আকাঙ্ক্ষিত শক্তিলাভের উপায়, যাদুমন্ত্র, ঔষধপত্র প্রভৃতি বিষয়ও থাকত। এছাড়া, গোষ্ঠীগত ব্রতপার্বন উপলক্ষে কৌমজনগোষ্ঠীর ব্রাত্যগানগুলিতেও বেদবাণীর উপাদান নিহিত আছে।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর সমসাময়িককালে ভারতীয় ঋষিগণের ব্যবহারিক প্রয়োজনে যতগুলি বেদবাণী প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত হয়েছিল, সেগুলিকে চারি অংশে সম্পাদনা করে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদ-ব্যাস' নামে আখ্যাত হন। বেদসূক্ত রচনা ও সংকলনের এই যুগকে (খ্রীষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী) বলা হয় বৈদিক যুগ। অসংকলিত আরো বহু বেদবাণী লোকাচারসংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব, আঙ্গিরস, সর্প, মায়া, দেবযান, ইতিহাস, পুরাণ,

পিশাচ ও অসুর নামক প্রাচীনকালের দ্বাদশ বেদের উল্লেখ পাই 'গোপথ ব্রাহ্মণে' (১।১।১০)। যাগযজ্ঞের বিরোধী অব্রাহ্মণ্যবাদী সম্প্রদায়গুলি উত্তরকালে তৎকালীন ভাষায় (জৈন ও বৌদ্ধগণ পালিভাষায়, শাক্ত ও শৈবগণ সংস্কৃত ভাষায়, গুহ্য সম্প্রদায় সন্ধ্যা ভাষায় ইত্যাদি) বেদবাণী সংকলন করেন। ইরাণবাসীগণের জেন্দ-আবেদ (বা 'ছন্দবেদ') এই বেদবাণীসমূহেরই সংকলন। নাথ-যোগী, বাউল ও সহজিয়াগণের বংশ-পরম্পরাগত সাধনগীতিসমূহে এবং সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীগণের প্রকৃতি-উৎসবের গানগুলিতে এই বেদবাণীর উপাদনগুলি পরিলক্ষিত হয়— অথর্ববেদের আমল থেকে সাঁওতালগণ এরোকাসিম, হারাইসিম, নিগুঁড্‌লি-নৌমাই, জান্‌থার ও সহরায নামক পাঁচটি শস্য-উৎসবের ব্রত পালন করেন। প্রত্যেকটি উৎসবের জন্য পৃথক পৃথক ব্রাত্যগান আছে, আর আছে মাঘসিম ও বাহা উৎসবের গান। মুণ্ডাদের সরহুল, কদ্‌লেতা-বাত্তাউলি, করম্‌, জোম্‌নামা-কোলাম্‌সিম্‌ ও মাঘে নামক পাঁচটি শস্য উৎসবের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ব্রাত্যগান আছে। ওরাঁওদের ধুমকুড়িয়া ও আখড়ায যথাক্রমে তরুণ তরুণীর স্বতন্ত্র গীতচর্চা হযে থাকে। বেদসমূহে যেমন প্রাণ-মন-প্রজ্ঞা ও ভূমাচেতনার স্পর্শ রযেছে—সেরূপ স্পর্শ মিশে আছে এই সব ব্রাত্য লোকশ্রুতিতে। পণ্ডিতপ্রবর কবি পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য 'সাহিত্যমেলা' মাসিকপত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যভিত্তিক বহু আলোচনা করেছেন। একদা বৃহত্তর গঙ্গাভূমি সকল বেদের অনুগামীদের মিলনস্থল ছিল ; কারণ, বাণিজ্যের প্রযোজনে সকল প্রান্তের মানুষ একদা পূর্বভারতের সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরে মিলিত হত। বেদবাণীর উপাদান সম্পর্কে এই সব মতবাদ, বৈদিক আর্য ও অনার্য বিষযক বৈষম্য দূরীকরণে সাহায্য করে। 'বৈদিক আর্যগণ বেদসূক্ত রচনা করলেও, প্রাচীনতর উন্নত জাতিসমূহের অবদান বেদবাণীর উপাদানগুলিতে নিহিত আছে', ইতিহাস-সম্মত এই ধারণা মনকে প্রসারিত করে।

পশ্চিমভারতে সিন্ধু উপত্যকা যেমন তাম্রপ্রস্তর যুগে সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হযেছিল, তেমনি পূর্বভারতে পশ্চিমবঙ্গের সুবর্ণরেখা ও কাঁসাই নদীর উপত্যকাও ঐ যুগের সভ্যতার প্রধান কেন্দ্ররূপে বিকাশ লাভ করেছিল। সিংভূম, ধলভূম, মানভূম থেকে বাঁকুড়ার বন-আসুরিয়া প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিযে কাঁসাই নদীর তীর ধরে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার লালগড়, রামগড় ও বর্ধমানের রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত যেসব পাথুরে হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে এটুকু

বোঝা যায় যে, নব্যপ্রস্তরযুগে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশকালে এ অঞ্চলের একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আজও সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধররা এ অঞ্চলে বিপুল পরিমানে ছড়িয়ে রয়েছে। ঝাড়গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে বিনপুর থানায় অন্তর্গত তামাজুড়ি গ্রামে তামার কুঠারফলক এবং আশেপাশে অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওযা গেছে আর ঝাড়গ্রামসংলগ্ন সিংভূমে রযেছে তামার খনি ; সুতরাং এ অঞ্চলে খনিজ তাম্রসম্পদের প্রাচুর্য ছিল এবং প্রাচীন পদ্ধতিতে তামার কাজও যথেষ্ট পরিমানে হত তা সহজে অনুমান করা যায়। বাণিজ্যের জন্য সে যুগের তাম্রদ্রব্যসমূহ এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হত বলে তৎকালীন পূর্বভারতের সর্বপ্রধান সমুদ্রবন্দরটি তামালিট্টস্, তাম্লিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত নামে পরিচিত।

তামা থেকে উদ্ভূত 'তামাম', 'তামাদি' প্রভৃতি বিদেশাগত অধুনা বাংলা শব্দসমূহ বাণিজ্যিকসূত্রে তাম্রলিপ্তের সঙ্গে আরবদেশসমূহের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের পরিচয বহন করে। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে এদেশের প্রাচীন বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথাও আগে বলা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন দেশসমূহে তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক মহিমা, সভ্যতা, শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করেছিল। বাংলায় অনেক মিশরীয় পদবী দেখতে পাই—দুই (ওভারসিযর), তা (প্রধান বিচারপতি), পাড়ুই (কর আদায়কারী), সাফুই বা সাবুই, রাহা, আশ, দে, সেন, হোড়, পান প্রভৃতি। পণ্ডিতপ্রবর পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতে—'সালকেৎ' নামক মিশরীয় বৃশ্চিকহস্তা দেবীর নাম থেকে হাওড়ার 'সাল্‌কে' বা 'সালকিয়া' নামের উৎপত্তি ; সালকিযায প্রাচীন কালী ঠাকুরের বাম পাযে কেন তেঁতুলবিছে আঁকা হত, তার সূত্র এখানেই। আস্‌কে-পিঠের 'আস্‌কে' মিশরীয—আর তার অর্থ হল সিদ্ধ, আড়মাছ মিশরীয় 'আড়', মিশরীয় ধন্বন্তরীর নাম 'টোট্‌কা'। বাণিজ্যসূত্রে যাতাযাত ও উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিযে এসব সম্ভব হযেছিল এই সমুদ্রবন্দরের কল্যাণে ; মিশরের মমি আচ্ছাদনের মূল্যবান কাপড় সম্ভবত এই বাঙলা থেকেই যেত। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম তপশীলী জাতির নাম 'লোহার' (অর্থাৎ লৌহকার) এবং অন্যতম তপশীলী উপজাতির নাম অসুর ; এই দুই গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা সেই আদিম যুগ থেকে লোহার ব্যবহার শিখেছিল মনে হয়। পাথর দিয়ে অস্ত্র তৈরী করতে করতে লোহাযুক্ত পাথরকে চিনেছে তারা ; ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, লোহাযুক্ত খনিজের বৃহৎ ভাণ্ডার ভারতেই রয়েছে—অন্যান্য খনিজের মত প্রচ্ছন্নভাবে নয়, প্রকাণ্ড পাহাড়ের আকারে এর অবস্থান।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সম্প্রতি আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি এলাকায় লৌহ নিষ্কাশনের প্রাচীন চুল্লীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। পাথর, তামা ও লোহা ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন করলেও, কৃষিজীবী প্রাচীন বাঙালীরা মাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল সর্বাগ্রে, জন্মভূমিকে তারা পবিত্র জ্ঞান করতে শিখেছিল; তাই অনেকে মনে করেন আদিবাসীদের 'বোঙ্গা' (অর্থাৎ পবিত্র) শব্দ থেকে 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি, সে অর্থে বঙ্গভূমির অর্থ 'পবিত্রভূমি'। ক্ষেত্রের অধিপতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়পন্থী প্রাচীন বাঙালীরা যখন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল, তখন ব্রাহ্মণ্যপন্থী আর্যভাষীরা ছিল যাযাবর ও পশুপালক।

যাহোক, প্রাচীনকালে বৃহত্তর গঙ্গাভূমি (Gangaridae) এলাকায় যে সব প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের বংশধররা বর্তমানে অধিকাংশই শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষদের পুর্বপুরুষরাই একদা সম্মিলিতভাবে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষতার পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিল এবং শৌর্য-সম্পদে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। গৌরবের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত সেই প্রাচীনবংশীয়দের উত্তরসূরীরা কালের আবর্তনে এখন তপশীলভুক্ত জাতি-উপজাতি এবং শিক্ষায় পশ্চাদ্‌পদশ্রেণী ও ধর্মান্তরিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে পরিগণিত। অমানবিক অস্পৃশ্যতার গ্লানিমুক্তির সংগ্রামে জয়ী হতে পারলে এবং আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সাংবিধানিক সাহায্যগুলি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে আবার তারা হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হতে পারবে। সেজন্য সমাজের উচ্চকোটির মানুষদের এবং বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সংবেদনশীল সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে বৃহত্তর গঙ্গাভূমি

দশহাজার বছরের প্রাচীন 'মাইক্রোলিথিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইট্‌স্ ইন্ডিং প্যালেলিথিক চপার্স এ্যাণ্ড্ পয়েন্টস্' চিহ্নাদি পাওয়া গেছে মেদিনীপুরের ওরগণ্ডা, শিল্দা, ঝাড়গ্রাম, অষ্টজুড়ি, শহরী, তাপাবাঁধ, কুক্‌ড়াখুপী, শিধ্‌নী, চিল্‌কিগড, চব্বিশপরগণার দেউলপোতা ও সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে, বাঁকুড়ার কাল্লালালবাজার, মনোহর, বন-আসুরিয়া, শহরজোড়া, কাঁকড়াদাঁড়া, বারুইডাঙ্গা, কাচিন্দা, জয়পাণ্ডা ভ্যালী, বর্ধমানের গোপালপুর, সাতকাহনিয়া, বিলগাবা, সাগরভাঙ্গা, আড়াখুরপীর জঙ্গল প্রভৃতি স্থানে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আবিষ্কৃত দুহাজার বছরের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে—মেদিনীপুরের তমলুক, চব্বিশপরগণার হরিহরপুর, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, বোড়াল, বেড়াচাঁপা, আটঘরা, হুগলীর আদিসপ্তগ্রাম, বাঁকুড়ার পোখর্ণা, বর্ধমানের ভেদিয়া পাণ্ডুরাজার ঢিবি, পশ্চিমদিনাজপুরের বাণগড এবং বাংলাদেশের মহাস্থানগড় প্রভৃতি। সুন্দরবনের 'দশ নম্বর লাট পাকুড়তলা,' সাগরদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, গদামথুরা, হাড়োয়া প্রভৃতি স্থানেও এরূপ প্রাচীন নিদর্শনসমূহের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাঁকুড়ার বড়ু-চণ্ডীদাসের ছাতনার অনতিদূরে শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যালেন্‌টাইন বল্‌ শুশুনিযার নিকটবর্তী বিহারীনাথ পাহাড়ের কাছাকাছি আদি-পুরাপলীয় যুগেব বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শুশুনিয়ার পাহাড় অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্ম ও হাতিযার সংগৃহীত হয়। ১৯৭০ সালে এই একই অঞ্চলে অজ্ঞাতযুগের হোমিনিড (মানবাকৃতি)-দের দেহাবশেষ 'চোযাল ও ভগ্নকবোটি' পাওযা গেছে। ভূতাত্ত্বিক ও শ্রেণীগত কারণে জীবাশ্ম ও হাতিযারগুলিকে এক লক্ষ বছরের পূর্ববর্তী নির্দেশ করা চলে; সুতরাং এখানকার প্রাচীনত্ব এবং মানবজাতির উৎপত্তিকাল থেকে এ অঞ্চলের অপরিসীম অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিযার (১৯১০) থেকে আমরা আরো কতকগুলি মূল্যবান তথ্য জানতে পারি—ভাগলপুরের মান্দার পাহাড়ের প্রাচীন নাম 'মাল্লাস'। সেখানকাব মল্ল বা বাগ্‌দী জাতির রাজ্য বীরভূম; এই সম্প্রদাযের মধ্যে 'মাল' পদবী সর্বত্রই ব্যাপকভাবে প্রচলিত [মেগাস্থিনিস ও প্লিনির রচনায এই মল্ল (Malli) জাতি ও মাল্লাস পাহাড়ের (Mount Mallus) সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে]। বিন্ধ্য পাহাড় প্রাচীনকালের রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুডা ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ তখন দাক্ষিণাত্যভুক্ত ছিল। বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির বন-আসুরিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত পাথরের কুঠারফলক এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। তৎকালীন দাক্ষিণাত্য ও ছোটনাগপুর উপত্যকায় নিম্নলিখিত স্থানসমূহ থেকে প্রস্তর-যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে—(১) জি. টি. রোডের গোবিন্দপুরের এগার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুন্‌ কুন্‌ গ্রামে, (২) হাজারিবাগ জেলার বোখারো কয়লা খনিতে, (৩) বাঁকুডা জেলার বিহারীনাথ পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে এগার মাইল দূরে গোপীনাথ পুরে, (৪) বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ কয়লা খনিতে, (৫) উড়িষ্যার ঢেনকানলে, (৬) উড়িষ্যার

সম্বলপুর জেলার কুন্দেরবুগা গ্রামের উত্তরে বুর্‌সপলির কাছে, (৭) উড়িষ্যার উম্‌উল্ কোলিকোটা গ্রামের নদীতটে, (৮) উড়িষ্যার তালচির হরিচন্দ-পুরে। দাক্ষিণাত্যের আবিষ্কারগুলি আর. ব্রুস ফুটের (R. Bruce Foote) এবং ছোটনাগপুর উপত্যকার আবিষ্কারগুলি ভি. বল্-এর (V. Ball)। মানভূমে ও সিংভূমে এবং মুঙ্গেরেও প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি তমলুক শহরে তাম্রলিপ্তের প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র' (Tamralipta Museum and Research Centre) স্থাপিত হয়েছে। এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত অসংখ্য নিদর্শনের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিককালের প্রস্তরায়ুধ ও অস্থিময় বাণমুখগুলি, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর তাম্রমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রাসমূহ, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর নানারূপ পোড়ামাটির নিদর্শনসমূহ নিঃসন্দেহে অতিশয় মূল্যবান সংগ্রহ। এছাড়া পরবর্তীকালের আরো বহু নিদর্শন এখানে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংগৃহীত হয়েছে। বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের পুরাকীর্তি, ইতিহাস এবং কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মধারা ও নূতন নূতন আবিষ্কারসমূহ বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধানে বিশেষ সহায়ক হবে। সুন্দরবন অভয়ারণ্যে লোথিয়ান দ্বীপ 'তমলুকের জঙ্গল' নামে অভিহিত; এখানে প্রাচীন মন্দির ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয়, সমুদ্র সরে যাওয়ায় তমলুক বন্দরের নৌঘাঁটি এখানকার সমুদ্রকূলে পর্যন্ত একদা সম্প্রসারিত হয়েছিল।

নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় সুন্দরবনের বদ্বীপসমূহে বিভিন্ন স্থানে মাটির তলা থেকে প্রাচীনপদ্ধতিতে নির্মিত একপ্রকার মৃৎপত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। হস্তনির্মিত এই পোড়ামাটির পাত্রগুলির অধিকাংশ '৫ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি' আয়তনবিশিষ্ট। মোচাকৃতি এই পাত্রগুলি সমতল স্থানে সোজাভাবে বসিয়ে রাখা যায়না। এর বাহির-পাশে 'বাস্কেট-চিহ্ন' বা ঝুড়ি-ছাপ আছে। এগুলির বয়স ঠিক কত তা জানা যায়না; কিন্তু 'প্রবাসী' (পৌষ, ১৩৫৬) পত্রিকায় শ্রীবিমল কুমার দত্তের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, অনুরূপ বাস্কেট-চিহ্নযুক্ত মৃৎপাত্র মিশরের প্রাচীন কবরের মধ্যে পাওয়া গেছে। শবদেহের সঙ্গে এরূপ মৃৎপাত্রসমূহে খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য উপকরণাদি দেওয়ার ব্যবস্থা মিশরে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন চীনে, মোটলেকস্ব টেম্‌সে ও অন্যান্য প্রাচীন স্থানে এর সন্ধান মিলেছে। দক্ষিণ-ভারতে আরিকামেডু নামক স্থানে ভারত সরকারের খননকার্যের ফলে

ওঁ্যারেন্টাইন স্তরের নিম্ন থেকে অনুরূপ বাস্কেট-চিহ্ন সমেত পাত্রখণ্ড পাওয়া গিয়েছে। প্রথমে যখন কুমারের চাকের প্রচলন হয়নি, তখন মানুষ এই বাস্কেট বা ছোট্ট ঝুড়ি বুনে তার উপর কাদা রেখে আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে এ ধরণের পাত্র তৈরী করত। তারপর রোদে শুকিয়ে নিয়ে সব সমেত আগুনে পুড়িয়ে নিত। তখন ঝুড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে যেত, আর পাত্রের গায়ে তার দাগগুলি থেকে যেত। অতি প্রাচীনকাল থেকে, সম্ভবতঃ নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে অতি প্রাচীন দেশসমূহে এই রকম চিহ্নযুক্ত মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে উক্ত চিহ্নের আসল উদ্দেশ্য ক্রমশঃ লোকে ভুলে যায়, আর ঐ চিহ্নগুলি আলঙ্কারিক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। সম্ভবতঃ কুমারের চাকের সাহায্য ব্যাতিরেকে অপেক্ষাকৃত কোন প্রাচীনতর সম্প্রদায় এমন প্রাচীন পদ্ধতিতে এগুলি প্রস্তুত করত; তাই বোধ হয় বহুস্থানে মাটির নীচে কেবলমাত্র এই পাত্রের স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, সেখানে কুমারশালায় প্রস্তুত নানাবিধ পাত্রের কোন চিহ্নও পাওয়া যায়না। কুমার কর্তৃক অন্যান্য পাত্রের সঙ্গে তৈরী না হয়ে, এগুলি পৃথকভাবে অন্য প্রাচীন সম্প্রদায় কর্তৃক তৈরী হত; আর এর 'পন' পোড়ানোর জ্বালানি হিসাবে ঘুটে ব্যবহারের পদ্ধতি জানা গেছে ছাই থেকে। সুতরাং তখন এ অঞ্চলে প্রচুর গরু ছিল বোঝা যায়। পশুপালক ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষরাই অধিক সংখ্যায় গরু পুষতো।

এই পাত্রগুলি 'কুঁড়ি' নামে পরিচিত, 'কুঁড়ি'র অর্থ 'ছোট্ট পাত্র'; 'হাঁড়ি-কুঁড়ি' শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। অনেকে বলেন এগুলি 'নুনের কুঁড়ি', তাই কেউ কেউ মনে করেন এই পাত্রে লবণ প্রস্তুত হত; কিন্তু কোনও প্রকারে এই পাত্রে লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, তবে লবণ রাখার জন্য অথবা পরিমাপ করার জন্য এগুলির ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু মৌর্য-কুষাণ, পাল-সেন ও অন্যান্য যুগের বসতিস্তরের নিদর্শনের সঙ্গেও এই পাত্রের অস্তিত্ব এমনভাবে দেখা যাচ্ছে যে, লবণের কাজ ছাড়া দেবস্থানে ও গৃহস্থালীর কোন বিশেষ-বিশেষ কাজেও এগুলির ব্যাপক ব্যবহার ছিল মনে হয়। তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় এবং কাকদ্বীপে গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্রে ও সুন্দরবন সন্নিহিত অন্যান্য সংগ্রহশালায় মূল্যবান প্রত্নসম্পদগুলির সঙ্গে এই বাস্কেট-চিহ্নযুক্ত পাত্রও প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত হয়েছে।

নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে, চব্বিশপরগণা জেলায়, কয়েকটি সংগ্রহশালায় পুরাকীর্তির বহু নিদর্শন সংরক্ষিত হয়েছে—হাড়োয়ায় [illegible] [illegible] সংগ্রহশালা, বারুইপুরে [illegible] [illegible] সংগ্রহশালা, [illegible]
[illegible]

সংগ্রহশালা, রামনগরে কালিদাস দত্ত সংগ্রহশালা, সাগরদ্বীপে বামনখালিতে মন্দিরতলা-সংগ্রহশালা ও মনসাদ্বীপে রামকৃষ্ণ মিশন সংগ্রহশালা, নামখানা-নারায়ণপুরে বঙ্গভারতী সংগ্রহশালা, কাকদ্বীপে গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র, ঠাকুরপুকুরে গুরুসদয় মিউজিয়াম, ব্যারাকপুরে গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, কাঁটালপাড়ায় ঋষি বঙ্কিম লাইব্রেরী এ্যাণ্ড মিউজিযাম, নিমপীঠে রামকৃষ্ণ আশ্রম সংগ্রহশালা, এছাড়া হাবড়ায অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা, যাদবপুরে অধ্যাপক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যাযের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর জেলায তমলুকে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা, খাড়াশ গ্রামে রজনীকান্ত জ্ঞানমন্দির, বাসুদেবপুরে পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় সংগ্রহশালা, তিলখোজায বিজন-পঞ্চানন সংগ্রহশালা, মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবন ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ (মেদিনীপুর জেলা শাখা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর কলেজে কেরী সংগ্রহশালা, শেওড়াফুলির সারদাচরণ মিউজিয়াম, রাজবলহাটের অমূল্য প্রত্নশালা, মহানাদে প্রাচ্যভবন ও চন্দননগরে মিউজিয়াম এ্যাণ্ড আর্ট গ্যালারি ইন্সটিটিউট ডি চন্দননগর প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। মালদহে রাজা রাজারাম মিউজিয়াম, মালদহ মিউজিযাম ও ইন্সটিটিউট অব ফোক্ কালচার, মুর্শিদাবাদের জেলা-মিউজিযাম ও হাজারদুয়ারী প্যালেস মিউজিযাম, পুরুলিযায জেলা-সংগ্রহশালা ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সংগ্রহশালা, বীরভূমের শান্তিনিকেতনে কলেজ মিউজিযাম ও রবীন্দ্রভবনে টেগোর মেমোরিযাল মিউজিযাম, পশ্চিমদিনাজপুরে জেলা-গ্রন্থাগার সংগ্রহশালা ও বালুরঘাট কলেজ মিউজিযাম উল্লেখযোগ্য। হাওড়া জেলায় নবাসনে আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা, বর্ধমান জেলায় বর্ধমান ইউনিভার্সিটি মিউজিযাম, বাঁকুড়া জেলায বিষ্ণুপুরে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন, কোচবিহার শহরে কোচবিহার সাহিত্যসভা, জলপাইগুড়ি শহরে ফণীন্দ্র দেব ইন্সটিটিউশন, দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ির অক্ষয়কুমার মৈত্র হিস্টরিক্যাল মিউজিয়াম এবং নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে গবেষক মোহিত রায়ের সংগ্রহশালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আশুতোষ মিউজিয়াম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বেহালায় ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট আর্কিওলজি গ্যালারি, বিড়লা একাডেমি অব আর্ট এ্যাণ্ড কাল্চার মিউজিয়াম, এথ্নোগ্রাফিক মিউজিয়াম, গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন কাল্চারাল ইন্সটিটিউট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি [illegible]

প্রত্নদ্রব্যগুলি বৃহত্তর গঙ্গাভূমি অর্থাৎ বৃহদ্বঙ্গের সমগ্র এলাকার প্রাচীন ইতিহাস গবেষণার যথেষ্ট সহায়ক। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের সমূহ প্রত্নস্থল ও পুরাকীর্তি-সংগ্রহশালার উপাদানগুলি বৃহত্তর গঙ্গারিডির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুশীলনে অপরিহার্য। যাবতীয় অনুমান, আলোচনা-পর্যালোচনা ও পুঁথিগত সাধনার কাজ এখন শেষ হয়েছে বলা যায়—গঙ্গারিডি-ইতিহাসের স্থান-কাল-পাত্রের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণে এখন শুধু প্রয়োজন পাথুরে প্রমাণ বা বস্তুবাদী নিরীক্ষা অর্থাৎ প্রত্নসম্পদ পর্যবেক্ষণ।

বৃহত্তর বঙ্গভূমির পশ্চিমাংশের চেয়ে পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত নবীন ; পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার নিম্নাংশে নূতন ভূভাগ গঠিত হয়েছে অনেক পরে। ভাগীরথীর নিম্নাংশে প্রাচীন গঙ্গাসাগরসঙ্গম তীর্থভূমি পর্যন্ত ভূভাগ-গঠন সম্পন্ন হয়েছে অনেকদিন আগে ; তারপর সুদীর্ঘকাল যাবত তার দক্ষিণে এই ভূমিগঠনের কাজ আর এগোয়নি। বরং ঐতিহাসিক যুগে সাগর-দ্বীপের দক্ষিণাংশ ভাঙতে ভাঙতে, ধীরে ধীরে গঙ্গাসাগর এগিয়ে এসেছে উত্তরদিকে, আর কপিল মুনির তীর্থমন্দিরগুলিও ক্রমান্বয়ে সরে সরে এসেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। ধ্বস নামার ফলে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ বিশাল অঞ্চলে সম্প্রতি আবার চড়া জাগছে ; এই সাগর-চড়া অনেকবার জেগে উঠেছে, আবার অনেকবার মিলিয়ে গেছে জলের তলায়। সমুদ্রবক্ষ থেকে দ্বারকানগরীর ধ্বংসাবশেষ যেভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেভাবে উৎখনন চালালে এখান থেকেই গঙ্গানগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হতে পারে। ওদিকে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশে ভূমিগঠনের কাজ কিন্তু অব্যাহত আছে।

যাহোক, পশ্চিমবঙ্গে উপসাগরকূলে মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণা ও বাংলাদেশের খুলনা জেলা থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যা পাওয়া গেছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হরিণঘাটা নদীর মোহনা পর্যন্ত ভূমিভাগ বেশ প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে মানববসতির লক্ষণ এ অঞ্চলে সুস্পষ্ট। কিন্তু তার পূর্বদিকের ভূমিভাগ অর্বাচীন। এ প্রসঙ্গে ডঃ প্রভাতকুমার ঘোষ গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকায় (নভেম্বর, ১৯৮৭ সংখ্যায়) 'ভাগীরথীর প্রাচীনত্ব' নামক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ভাগীরথী-গঙ্গা নিম্নবাংলায় পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র বা অন্যান্য নদীর তুলনায় অনেক আগে থেকেই নূতন ভূভাগ গঠন করেছে। বিদেশী লেখকেরা গ্রীক ও লাতিন ভাষায় যখন গঙ্গারিডি ও প্রাসীর কথা বিবৃত করে গেছেন, তখন অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের অভিযানোত্তর যুগে আমাদের গঙ্গারিডি চিহ্নিতকরণে এই অবস্থার কথা

মনে রাখতে হবে। কারণ মোটামুটিভাবে পুণ্ড্র বরেন্দ্রী ও রাঢ়-তাম্রলিপ্ত অঞ্চলই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের প্রাচীনতর পলিভূমি এবং পূর্ববাঙলা একান্তই নবভূমি, এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা, কাছাড়ের উত্তরাংশ ও শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চল, ঢাকা ও মৈমনসিং জেলার বনময ও গৈরিক পার্বত্য-ভূমি সমন্বিত স্থানগুলি পূর্ববাঙলার পুরাভূমির অন্তর্গত। ডঃ ঘোষের এই বক্তব্য থেকে এবং আমাদের পূববর্তী আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয যে, উপবঙ্গে দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধনই প্রাচীনকালে গঙ্গারিডি অর্থাৎ গাঙ্গেয জনগোষ্ঠীর আদিবাসভূমি ছিল এবং টলেমির ভূগোল ও পেবিপ্লাসে উল্লিখিত গঙ্গানগরকে কেন্দ্র করে একদা যে জনপদ ও রাজ্য গড়ে উঠেছিল, গ্রীস ও রোমান ঐতিহাসিকগণ তাকেই গঙ্গা-জনপদ ও গঙ্গারিডি রাজ্য নামে অভিহিত করেছিলেন। প্লিনি প্রাসী বা প্রাচ্যদেশ অর্থাৎ মগধের প্রতি গুরুত্ব আবোপ কবায তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত এলাকাকে বৃহত্তর 'প্রাসী' হিসাবে উল্লেখ কবেছেন, আর ডিওডোবাস গাঙ্গেযদের প্রতি অধিক গুরুত্ব আবোপ কবায সমগ্র মগধসাম্রাজ্যকেই 'গঙ্গারিডি' কন্‌ফেডারেশন হিসাবে উল্লেখ কবেছেন। যাহোক, আমরা উত্তরবঙ্গেব মহাস্থান-শিলালিপি থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গেব প্রত্নস্থল ও সংগ্রহশালাগুলির নিদর্শন থেকে দক্ষিণে সাগবদ্বীপ পর্যন্ত ভূখণ্ডে খ্রীষ্টপূর্বকালেব বসতিস্তবেব সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই।

দক্ষিণ-চব্বিশপবগণার দেউলপোতা, হবিনারাযণপুর, পাকুড়তলা, মন্দিরতলা এবং উত্তর চব্বিশপবগণাব বালান্দা, চন্দ্রকেতুগড প্রভৃতি স্থান থেকে মৌর্য আমলেব যেসব মুদ্রা আবিষ্কৃত হযেছে, তার মধ্যে একপিঠে হস্তী (আবোহীসহ), বৃষমুণ্ড, স্বস্তিকা ও ইন্দ্রযষ্টি এবং অপব পিঠে চৈত্য, ক্রশ, বৃষমুণ্ড ও ঘেবাব মধ্যে গাছ প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত মুদ্রাগুলিব বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। পাকুড়তলায প্রাপ্ত উ প্রকাব মুদ্রাব 'ছাঁচ' থেকে প্রমাণিত হয যে, বৌদ্ধযুগে এ অঞ্চল থেকে একদা এ ধরণের মুদ্রা প্রস্তুত হত। সমগ্র পূর্বভারতে এ ধরণেব প্রাচীন মুদ্রাব সন্ধান পাওযা গেছে বলে জানা যায। মৌর্যযুগীয মুদ্রা হিসাবে পবিগণিত হলেও এই মুদ্রায কিন্তু মৌর্য রাজবংশেব কোন প্রতীক বা চিহ্ন নেই। হস্তী ছিল বৃহত্তর গঙ্গাভূমি বা গঙ্গাবিডির জাতীযচিহ্ন, আর ধর্মীয স্বস্তিকা চিহ্ন যে কত প্রাচীন তা ধারণাতীত এবং ধর্মীয় যুক্ত-চিহ্নটি সম্ভবত মৈত্রী বা সমন্বযের চিহ্ন হিসাবে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, আর চৈত্য-চিহ্নে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব অনস্বীকার্য। ঘেরার মধ্যে গাছটি বোধিবৃক্ষের প্রতীক হতে পারে। মৌর্যযুগীয় এই মুদ্রাগুলি সম্ভবত

বৃহত্তর গঙ্গারিডি কনফেডারেশনের মুদ্রা হিসাবেই সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে বৃহদ্বঙ্গের সর্বত্র বণিকগণ কর্তৃক প্রচলিত হয়েছিল; এই মুদ্রায় কোন রাজবংশের পরিচয় মেলেনা। মহাস্থান শিলালিপিও এই মৌর্য যুগেরই নিদর্শন; এই লিপি বাঙলার প্রাচীনতম শিলালিপি। এ থেকে আমরা পুণ্ড্রবর্ধনে সমবায় প্রথার পরিচয় পেয়েছি; এর মধ্যেও রাজতন্ত্রের কোন আভাস মেলেনা। বিক্রমপুরের পশ্চিম থেকে বর্ধমান পর্যন্ত গঙ্গারিডি মূলরাষ্ট্রের প্রাচীনতর এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে একদা এই পুণ্ড্রবর্ধনের সীমানার মধ্যেই ছিল। হরিণঘাটা থেকে প্রাচীন-সরস্বতী পর্যন্ত এলাকায় আমরা যে প্রাচীন নিদর্শনগুলি পাই, তা প্রাচীন পৌণ্ড্রসংস্কৃতির নিদর্শন, তথা গঙ্গারিডি-সংস্কৃতির নিদর্শন।

কাকদ্বীপে গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্রে রক্ষিত আমার সংগৃহীত পুরাদ্রব্য-গুলির মধ্যে মৌর্যযুগীয় তাম্রমুদ্রা, সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রস্তরমূর্তি, বাস্কেট চিহ্ন যুক্ত পাত্র, পশুকঙ্কালের ফসিল, প্রস্তরীভূত দন্ত, পোড়ামাটি-নির্মিত কুবের মূর্তির পদযুগল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাকুড়তলা গ্রামে একটি দেবালয়ে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হয়, যার দুটি হাতের কনুই থেকে থেকে আর-দুটি হাত বাহির হয়েছে। এ ধরণের মূর্তি এ পর্যন্ত কেবলমাত্র সরস্বতী থেকে আদিগঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যেই পাওয়া গেছে; এই মূর্তির শিরস্ত্রাণে দক্ষিণভারতীয় শৈলী পরিলক্ষিত হয়। কাকদ্বীপের সন্নিকটে পুকুরবেড়িয়া গ্রাম থেকে এ ধরণের একটি ছোট্ট প্রস্তরমূর্তি এবং সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা থেকে সংগৃহীত এ ধরণের একটি পোড়ামাটির বিষ্ণুমূর্তি গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্রে রক্ষিত হয়েছে। ‘ছ-নম্বর লাট ধানি’ থেকে প্রাপ্ত একটি বিদেশিনী মূর্তিতে গ্রীকো-রোমান শৈলী সুস্পষ্ট। এরূপ মূর্তি পাকুড়তলা ও পুকুরবেড়িয়া থেকেও সংগৃহীত হয়েছে। বৃহত্তর গঙ্গাভূমির প্রাচীন মুণ্ডমূর্তিগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য: তাম্রলিপ্ত ও সুন্দরবন থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় মাটির তলা থেকে নানা ধরণের মুণ্ডমূর্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, এর মধ্যে কতকগুলির ভিতরদিক ফাঁপা অর্থাৎ ছোট অথবা বড় ঘটের উল্টোদিকে প্রস্তুত, এগুলিকে বারামূর্তি বলা হয়। আর কতকগুলি মুণ্ডমূর্তির ভিতরদিক ফাঁপা নয়, ভরাট—এগুলির পূজা আদিম নৃমুণ্ড-শিকারীদের প্রথা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। চব্বিশ-পরগণা জেলায় বর্তমানেও বারাপূজার প্রচলন আছে—একটি দেবমূর্তি ও একটি দেবীমূর্তি পাশাপাশি বসানো হয়। এই দেবমূর্তি বাস্তুদেবতা ‘দক্ষিণরায়’ নামে খ্যাত, আর দেবীমূর্তি ‘নারায়ণী’ নামে অভিহিত।

দক্ষিণ ভারতেও এ ধরণের দেবদেবীর বারামূর্তি পূজার প্রচলন আছে। এ ছাড়া দক্ষিণরায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তিপূজার প্রচলনও আছে চব্বিশপরগণায়; তিনি বন ও বাঘের অধিষ্ঠাতৃ আরোগ্য-দেবতা 'দক্ষিণরায়'। মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণের আগমনকালে সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁর আবির্ভাবের কথা জানা যায়। কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত ব্যাঘ্রবাহন দেবদেবী মূর্তিটিকে আরও প্রাচীন ব্যাঘ্রদেবতা হিসাবে অনেকে অনুমান করেন। যাহোক, বাস্তুদেবতা বারাঠাকুর দক্ষিণরায় এবং আরোগ্যদেবতা অরণ্যদেব দক্ষিণরায় সম্পূর্ণ পৃথক। মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত ফাঁপা ও ভরাট উভয় প্রকার মুণ্ডমূর্তি কয়েকটি আমাদের সংগ্রহে আছে। দক্ষিণভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের সুস্পষ্ট প্রমাণ এই মূর্তিগুলি।

আটঘরায় প্রাপ্ত দ্বিমেষ-বাহিত অগ্নিমূর্তি থেকে এ অঞ্চলে অগ্নি-উপাসকগণের অস্তিত্বের পরিচয় মেলে; সেরূপ অগ্নিমূর্তির মস্তকের অনুরূপ একটি মস্তক ও মেষমুণ্ড পাকুড়তলায় পাওয়া গেছে এবং আটঘরায় প্রাপ্ত খেলনা-গাড়ীর একটি মেষমূর্তি আমাদের সংগ্রহে আছে। চন্দ্রকেতুগড়ের সীলমোহরে সমুদ্রগামী জলযানের প্রতিকৃতি গঙ্গারিডিদের রণপোত ও নৌবাণিজ্যের পরিচয় প্রদান করে। এছাড়া বৃষ, অশ্ব, হস্তী, সর্প, পক্ষী প্রভৃতি মূর্তিগুলিকে প্রাচীন অধিবাসীদের টোটেমপূজার নিদর্শন মনে করা হয়। এ ধরণের কিছু সংগ্রহও আমাদের গবেষণাকেন্দ্রে আছে। আর আছে পোড়ামাটির শিশুকোলে-মাতৃমূর্তি ও পাথরের শিশ্নাকৃতি শিবলিঙ্গ এবং বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ধরণের পাত্র ও পোড়ামাটির বাটখারা; আচার্য সুকুমার সেন তাঁর 'বঙ্গভূমিকা'য় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ভিক্ষাপাত্রের যে সচিত্র উল্লেখ করেছেন, সেরূপ পাত্রও আছে আমাদের সংগ্রহে। মিশরীয় মাদুলির অনুরূপ পতঙ্গদেহ-ব্রোঞ্জমাদুলি, গহনার অংশ এবং নানা-বর্ণের নানারূপ পুঁতি, পাথর ও পোড়ামাটির মালাদানার বয়স অনুমান করা শক্ত। পাথরের বিষ্ণুপাদপীঠ ও সরস্বতীমূর্তি এবং পোড়ামাটির মন্দিরফলক কয়েকটি আমাদের সংগ্রহে আছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মাপের প্রাচীন ইট, ঘরছাওয়া টালি, পাতকুয়ার অংশ, পাখী-বাঁশী, মুণ্ডমূর্তির চূড়া, নর্তকীমূর্তি, মাটির প্লেট, প্রদীপ, পাতাছাপ-প্রদীপ, ধুনাচি, গজমুণ্ড-ধুনাচি, ধূপদানি, খেলনা-গাড়ীর চাকা, পোড়ামাটির ঢাকনা, এ্যাম্ফোরার উপরাংশ, বোলে (কাঁচা-হাঁড়ি পেটাইয়ের সময় ভিতরে ধরার যন্ত্র) এবং কিছু মধ্যযুগীয় পুঁথি পাওয়া গেছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে। এছাড়া পশ্চিমদিনাজপুর ও নদীয়া জেলার কিছু নিদর্শন আমাদের সংগ্রহে

আছে। এগুলি সব গঙ্গারিডিদের আমলের নয়, কিছু সে আমলের সমসাময়িক এবং কিছু উত্তরকালের, কিন্তু বিভিন্ন আমলের যোগসূত্র নিহিত আছে এই সব প্রত্নসম্পদের মধ্যে। গঙ্গারিডি গবেষণাক্ষেত্রে সংগৃহীত পুরাতন প্রস্তরযুগ ও নব্য প্রস্তরযুগের হাতিয়ারগুলি রাজস্থানের চিতোরগড় জেলার গম্ভীরী নদীর ভাঙ্গন থেকে প্রাপ্ত। বৃহত্তর গঙ্গারিডি এলাকার বাহিরে এগুলি লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছিল; সেখানকার এই নিদর্শনগুলি এবং এ অঞ্চলের দেউলপোতা, নলরাজার গড় ও পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগৃহীত নিদর্শনগুলি সাদৃশ্যযুক্ত। সাগরদ্বীপের মন্দিরতলায় হুগলী নদীর ভাঙ্গনে প্রাপ্ত এরূপ একটি ফ্লিন্ট পাথরের ছোট্ট হাতিয়ার একদা সাগর দ্বীপ পর্যন্ত এলাকায় নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের উপস্থিতির আভাস প্রদান করে। এই হাতিয়ারের ছিদ্রমধ্যে একটুকরো প্রবালের অস্তিত্ব কৌতূহলের উদ্রেক করে; প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কালীঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত স্থানকে প্রবাল-দ্বীপের অন্তর্গত বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি জেলার যাবতীয় সংগ্রহশালার প্রত্নদ্রব্যগুলি সম্পর্কে আমি আমার 'গঙ্গারিডি: ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ' এবং 'প্রত্নসম্পদ উদ্ধারে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা ও গঙ্গারিডি প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিস্তর প্রাগৈতিহাসিক যুগের

কেউ কেউ মনে করেন, দক্ষিণবঙ্গের ভূমিস্তর অতিশয় অর্বাচীন; কিন্তু এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন বসতিস্তর ও প্রত্নসম্পদগুলি থেকে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ অত্যধিক প্রাচীন। পশ্চিমদিকের প্রাচীনতম গঙ্গাখাত অর্থাৎ প্রাচীন-সরস্বতীর পশ্চিমে বৃহত্তর রাঢ়ের মালভূমি অঞ্চলে মানবজাতির বিকাশকাল থেকেই স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল, আর ঐ নদীর পূর্বপারেও সমান্তরালভাবে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত ভূমিগঠনের কাজ প্রায় একই সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল। তাই এপারে দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, মন্দিরতলা প্রভৃতি স্থানে প্রস্তরযুগের হাতিয়ার পাওয়া সম্ভব হয়েছে; কিন্তু ঐ যুগের বাসস্থানের অন্যান্য ব্যবহারিক নিদর্শন বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। তা থেকে, মানবজাতির বিকাশকালেও এ অঞ্চলে খাদ্যান্বেষী নেগ্রিটো গোষ্ঠীর উপস্থিতির প্রমাণ মেলে, কিন্তু কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিজীবী কৌমগঠনকারী অস্ট্রিকদের বাসস্থান রচনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মানস্থানের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইট-পাথরের মধ্যে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য ও নগরসভ্যতার স্পর্শ অনুভব করা যায়।

নেগ্রিটো ও অষ্ট্রিকদের আমলে এই নিম্নাঞ্চলের বনাকীর্ণ জলাভূমিগুলি মনুষ্যবাসের উপযোগী ছিল না। রামায়ণের যুগ পর্যন্তও এই সাগরদ্বীপ অধ্যুষিত অঞ্চল মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত রসাতলরূপে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি, তার আগে ওপার থেকে এপারে দু-এক স্থানে শিকার অন্বেষণে কোন দলের সাময়িক উপস্থিতি ঘটেছিল বোধ হয়। তারপর সাগরতটের নির্জন দ্বীপে সাংখ্যদর্শন প্রবক্তা কপিলমুনি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। সেখানে সূর্যবংশীয় সগর রাজার উপনিবেশ স্থাপনে ব্যর্থতার কথা রামায়ণে বর্ণিত হযেছে ; কিন্তু তার আগেই করতোযা তীরে পুণ্ড্রগণের কৌম জনপদ গঠিত হয়েছিল। তখন তার দক্ষিণে আর কোন জনপদ ছিলনা, সেখানে ছিল প্লাবিতর ভূমি, অর্থাৎ শুধু জল আর জঙ্গল ; কিন্তু কালীঘাট থেকে আরম্ভ করে গঙ্গার সমুদ্রসঙ্গম পর্যন্ত 'প্রবালদ্বীপ' নামে কথিত অঞ্চলে এই ভূমিগঠন হযেছিল অনেক আগে, আর কপিলতীর্থ সাগরদ্বীপ ছিল অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি। মহাত্মা ভাগীরথ এই এলাকায় ভাগীরথী-গঙ্গাকে বইয়ে এনেছিলেন ; তারপর থেকে ভাগীরথীর পলিভূমি ক্রমান্বয়ে কৃষিক্ষেত্র ও মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়েছিল এবং পুণ্ড্রবর্ধনের যোদ্ধৃজনগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনেই তাদের দক্ষিণের জঙ্গলময় এলাকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং তাদেরই একটি দল এই ব্রাহ্মণবিহীন অরণ্য অঞ্চলে দুর্ভেদ্য আশ্রয় রচনা করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকলাপ থেকে বিচ্যুত হযে তারা ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হয়েছিল মহাভারতীয় যুগে।

তারা ছিল বিপুল ঐশ্বর্যশালী ; একদা গঙ্গাসাগরসঙ্গমতীর্থে তারা নগর স্থাপন করেছিল। বিদেশী ঐতিহাসিকগণ সেই নগরকে 'গঙ্গা' নগর এবং গাঙ্গোপদ্বীপে তাদের রাজ্যকে 'গঙ্গারিডি' রাজ্য এবং বৃহত্তর গঙ্গাভূমি অর্থাৎ বৃহদ্বঙ্গের সম্মিলিত জনগোষ্ঠীসমূহকে গাঙ্গেয় ('Gangarıdaı') মহাজাতিরূপে অভিহিত করেছেন। অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীনকালে দক্ষিণবঙ্গ জলের তলায় ছিল এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল আরও অনেক উত্তরে। সেজন্য গঙ্গারিডিদের রাজ্য বর্তমান গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কি না এ সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন। অতি প্রাচীনকালে সমুদ্র উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে এসেছে একথা ঠিক ; কিন্তু সেই ভূমিগঠনের কাজ এদিকে কতকাল আগে ঘটেছিল তা অনুমান করা সম্ভব নয়। দেগঙ্গা, দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, মন্দিরতলা প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সব প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিস্তর প্রাগৈতিহাসিক যুগের।

পরিশিষ্ট ঃ পর্যালোচনার আলোকে

অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক ও গঙ্গারিডি-গবেষক ডঃ প্রভাতকুমার ঘোষ এই নিবন্ধ থেকে পাঁচটি অংশের উদ্ধৃতিসহ নিম্নরূপ সমালোচনা করেছেন—

সমীক্ষা ঃ গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি ॥ ডঃ প্রভাতকুমার ঘোষ

১। "মেগাস্থিনিস ও প্লিনির বর্ণনায ওডুম্বরী (Odomboerae) নামক জনগোষ্ঠী ও জনপদের বিশেষ উল্লেখ আছে, প্রাচীন বঙ্গের মানচিত্রে উত্তর-রাঢের উত্তরাংশ ঔডুম্বরিক হিসাবে পরিগণিত. ." (পৃঃ ৫৭)—ডঃ নীহাররঞ্জন রায তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' গ্রন্থে তৃতীয অধ্যাযে (দেশ পরিচয—পশ্চিমসীমা) বলেছেন, "সপ্তম শতকে রাজা জযনাগের (রাজধানী কর্ণসুবর্ণ?) বপ্পঘোষবাট পট্টোলিতে ঔডুম্বরিক বিষয় নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদের উল্লেখ আছে। আবুলফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঔদম্বর সরকার পূর্ণিযা সরকারের দক্ষিণসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মুর্শিদাবাদ বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ..." একমাত্র ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট একটি মানচিত্রে রাজমহলের দক্ষিণ থেকে মুর্শিদাবাদ/বীরভূম পর্যন্ত ভূভাগকে ঔডুম্বরিক বলে দেখানো হযেছে, কিন্তু প্লিনি যে ওডুম্বরী (Odomboerae) জনপদ/জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধুনদের অববাহিকায পার্বত্য ও মরুভূমিময অঞ্চলের নিকট, অথবা সিন্ধুনদের দক্ষিণে পশ্চিম সাগরের উপকূলে বা সমীপবর্তী কোন স্থানে হবে বলেই মনে হয়। এই সম্পর্কে 'The Classical Accounts of India (Pliny)' দ্রষ্টব্য। এই জনপদ/জনগোষ্ঠীর উল্লেখ (২৩) বন্ধনীর মধ্যে পাওয়া যায। এই (২৩) বন্ধনীর বিবরণগুলি সমস্তই প্রায পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানের। (২২) বন্ধনীর মধ্যে বিবৃত স্থানগুলির মধ্যে আমরা প্রাচ্য ভারতের জনপদ-গুলির পরিচয পাই, সুতরাং প্লিনী যে ওডুম্বরীর কথা বলেছেন তা উত্তর-রাঢের কোন অংশবিশেষ বা উত্তর-রাঢ কি না, সে বিষযে যথেষ্ট সংশযের অবকাশ আছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রাযের বিবরণ ছাড়া, আমাদের অন্য কোন দেশীয় ঐতিহাসিকের বিবরণে প্রাচীন যুগে ঔডুম্বরিক অথবা ঔডুম্বর বলে উত্তর-রাঢের কোন জনপদ/জনগোষ্ঠীর উল্লেখ নেই। সেইজন্য মনে হয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায যে ঔডুম্বরিক বিষয়ের কথা বলেছেন, তার অস্তিত্ব হযতো প্রাচীন যুগের শেষ অথবা মধ্যযুগের আগে ছিল না। ডঃ বিমলাচরণ লাহার অভিমত অনুযায়ী ঔডুম্বরেরা 'মধ্যদেশের' লোক এবং হয়তো কুরুদেশের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, পাঞ্জাবের (বর্তমান হিমাচল প্রদেশ) কাংড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত কতকগুলি মুদ্রা থেকে ঔডুম্বরদের সম্বন্ধে জানা যায় এবং তারা হয়তো পাঠানকোট অঞ্চলের

অধিবাসী ছিল ('Tribes in Ancient India' এবং 'Historical Geography of Ancient India' দ্রষ্টব্য)। 'Classical Accounts of India' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট একটি মানচিত্র থেকে এই অভিমত সমর্থিত হয়।

২। "...উত্তর-রাঢ ও দক্ষিণ-রাঢের স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী ও জনপদগুলির বিশেষ উল্লেখ গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণের বিবরণে আছে, এ ছাড়াও তাঁরা পৃথকভাবে গঙ্গার শেষাংশে গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠী ও জনপদের সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। ." (পৃঃ ৫৭)—প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বিদেশী লেখকেরা তদানীন্তন উত্তর-রাঢ, দক্ষিণ-রাঢ প্রভৃতি জনপদ/জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্রভাবে কোন উল্লেখ করেন নি। কেবলমাত্র প্লিনীর বিবরণে আমরা তালুক্তেয়ী (Taluctae) নামটি পাই যা হয়তো তখনকার তাম্রলিপ্ত নগর/বন্দর/জনপদকে বুঝিয়ে থাকবে, যেমন টলেমি তামালাইটস্ (Tamalites)-দের কথা বলেছিলেন। অবশ্য কোন কোন জনপদ/জনগোষ্ঠীর উল্লেখ তাঁরা করেছিলেন (প্লিনীর বিবরণ দ্রষ্টব্য)। মেগাস্থিনিস থেকে আরম্ভ করে কোনও গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিক, যথা—প্লিনী, সলিনাস, ডিওডোরাস প্রভৃতি কেউই এমন কথা বলেন নি যার থেকে সিদ্ধান্ত অথবা অনুমান করা যায় যে "অতএব গঙ্গারিডি জনপদটি ছিল এই জনপদগুলির পূর্বদিকে গঙ্গার শেষাংশে অর্থাৎ গাঙ্গোপদ্বীপ অঞ্চলে।" ব্যতিক্রম একমাত্র টলেমি, যিনি বলেছিলেন যে গঙ্গার মোহনাগুলির কাছের অঞ্চলগুলি গঙ্গারিডেইদের দ্বারা অধিকৃত ছিল (সেই সময়ে গঙ্গার মোহনাগুলি কোথায় ছিল, তাই বিশেষ গবেষণার বিষয়, কারণ গঙ্গাসাগর সে যুগে অনেক উত্তরে।)। প্লিনী, ডিওডোরাস, প্লুটার্ক, জাস্টিন, স্ট্রাবো—এঁদের প্রায় সকলের বর্ণনাই মেগাস্থিনিসের লুপ্ত গ্রন্থ 'ইণ্ডিকা'র বিবরণের উপর নির্ভরশীল। এঁরা কেউই গঙ্গারিডি জনপদের কথা বলেন নি, অথবা বলেন নি যে গঙ্গারিডি জাতি/দেশ গঙ্গার সাগরসঙ্গমের কাছাকাছি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, বরং প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন (বিশেষভাবে ডিওডোরাস, প্লুটার্ক, জাস্টিন প্রভৃতি) যে বিপাশা নদী অতিক্রম করে পূর্বদিকে অগ্রসর হলে বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে এগারোদিনের পথের শেষে এক বিশাল নদী, যার অপর দিকে প্রাসী এবং গঙ্গারিডি নামে দুটি দেশ, যাদের রাজার অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী (পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তী সমন্বিত) আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছিল। প্লিনী লিখেছেন যে এই নদী (গঙ্গা) তার শেষভাগে গঙ্গারিডেসদের দেশের (Country) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই বর্ণনা থেকে এমন ধারণা হওয়া যুক্তি-সঙ্গত নয় যে গঙ্গারিডি দেশ (তাঁরা জনপদ/জনগোষ্ঠীর কথা বলেন নি!)

রাঢ, তাম্রলিপ্ত অঞ্চল বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গঙ্গোপদ্বীপে অবস্থিত ছিল। তা হলে, প্লিনী (গঙ্গার পশ্চিমতীরে) গঙ্গারিডি-কলিঙ্গেযীর কথা বলতেন না, শুধু কলিঙ্গেযীর উল্লেখ করতেন। প্লিনীর বর্ণনা অনুযায়ী রাঢ, তাম্রলিপ্ত অঞ্চলও নিঃসন্দেহে গঙ্গারিডি দেশ/জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩। "ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ড. দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ অকাট্য যুক্তিসহকারে যা বলেছেন, তাতে টলেমির সুস্পষ্ট বিবরণই সমর্থিত হয়" (পৃঃ ৫৭)—টলেমির বিবরণ যে অনেক ত্রুটিপূর্ণ, সে বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবিদগণ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ মন্তব্য উল্লেখের অপেক্ষা রাখে—"Ptolemy wrote a geographical account of India in the second century A. D. on scientific lines His data being derived from secondary sources, he has fallen into numerous errors, and his general conception of the shape of India is also faulty in the extreme. Nevertheless this attempt was Praiseworthy and has supplied Valuable information" (History and Culture of Indian People—Vedic Age—Foreign Accounts, by Bharatiya Vidya Bhavan) সুতরাং টলেমির ভৌগোলিক বিবরণের প্রামাণিকতা অথবা বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকমাত্রেরই সন্দিহান হওয়া সমীচীন। টলেমির ভৌগোলিক বিবরণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল অথবা স্বকপোলকল্পিত কোন যুক্তির দ্বারা—গঙ্গারিডি কেবলমাত্র গঙ্গার পূবতীরে অবস্থিত ছিল বললেই (যা উপর্যুক্ত তিনজন ঐতিহাসিকও বলেছেন) তা অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিপন্ন হয় না। তা ছাড়া টলেমির বর্ণনা অনুযায়ীও গঙ্গার দুটি মুখ (অন্ততঃ প্রথম মুখটি তো বটেই) পশ্চিমবঙ্গে তথা গঙ্গার পশ্চিমদিকে পড়ে।

৪। "··· উপবঙ্গের সভ্যতা অর্থাৎ গঙ্গারিডি সভ্যতা · কোনমতেই নয়" (পৃঃ ৫৮)—গঙ্গারিডি শুধুমাত্র উপবঙ্গেই ছিল—এই সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গবেষণার মহত্ত্বকে ও মানকে নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত / উন্নীত করবে না। গঙ্গারিডি একটি সঙ্কীর্ণ ভূভাগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল—বিদেশী লেখকেরা (একমাত্র টলেমি ব্যতীত) এমন কথা কেউই বলেন নি। উপর্যুল্লিখিত মন্তব্যের মধ্যে (৪) সত্য এবং তথ্য, দুইই অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে—এমন কথা বললে হয়তো কারোর প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৫। "যাহোক গঙ্গার মোহনা অঞ্চলের বদ্বীপসমূহে গঙ্গারিডিদের মূল বাসভূমি ছিল এবং 'তাদের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গঙ্গানগরকে অবলম্বন করে গঙ্গা জনপদ ও গঙ্গারিডি রাজ্য গড়ে উঠেছিল'— বিদেশী লেখকদের রচনাসূত্র অবলম্বনে স্থিরীকৃত এই মতবাদে আমরা বিশ্বাসী" (পৃঃ ৫৯)— যুক্তি, তর্ক, তথ্য প্রভৃতিকে এমন কি আংশিকভাবেও উপেক্ষা করে কোন "স্থিরীকৃত" মতবাদই ইতিহাসসম্মত ও বাস্তব হযে ওঠে না। তাছাড়া, বিদেশী লেখকেরা কেউই গঙ্গারিডি জনপদের কথা বলেন নি। তাঁরা বলেছেন গঙ্গারিডি দেশ / জাতির কথা। 'গঙ্গে' অথবা 'গঙ্গা' হযতো একটি নগর / বন্দর ও জনপদ ছিল, যা ছিল গঙ্গারিডিদের রাজধানী, তাও মেগাস্থিনিসের যুগে নয়। কারণ, এই 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গা' নগরের কথা মেগাস্থিনিসভিত্তিক (প্লিনী পর্যন্ত) কোন ঐতিহাসিকই বলেন নি। বলেছেন "পেরিপ্লুস" গ্রন্থকার (অজ্ঞাতনামা নাবিক) খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে এবং টলেমি খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে। ঐতিহাসিকদের বিবরণ এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় যে গ্রীক ও রোমক লেখকেরা আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে এক বৃহৎ গঙ্গারিডি দেশ / জাতির অস্তিত্বের কথাই বলতে চেযে ছিলেন যারা একদিকে প্রাসীর (মগধ) সঙ্গে অন্যদিকে পরে কলিঙ্গের সঙ্গে, রাজনৈতিক / অর্থ নৈতিক রাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পরে, এবং কলিঙ্গরাজ খারবেলের আক্রমণের (খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী) ফলে এই গঙ্গারিডি দেশ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে অনেকগুলি অংশে বিভক্ত হযেছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি এক সঙ্কীর্ণ গঙ্গারিডি দেশের ছবিই অঙ্কিত করেছিলেন যা মেগাস্থিনিস এবং মেগাস্থিনিসের বিবরণের অবলম্বনে লিখিত লেখকদের বর্ণনায প্রকাশিত বিশাল গঙ্গারিডি অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র, এবং হয়তো গঙ্গা নদীর মোহনা অঞ্চলগুলিতেই সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশীয সূত্রে গঙ্গারিডির কোন বিবরণ না থাকায, এই সব সঠিকভাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন! —৬ / ১১ / ১৯৮৭।

সবিনয় নিবেদন : সমালোচনার উত্তরে

১। উপরিউক্ত প্রথম মন্তব্য প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হল— বিষয শব্দের অর্থ 'জনপদ' বা দেশ এবং সরকার শব্দের অর্থ 'রাজস্ব আদায়ের বিভাগ স্বরূপ কয়েকটি পরগণার সমষ্টি'। সপ্তম শতকের 'ঔডুম্বরিক বিষয়' বলতে একটি ক্ষুদ্র জনপদ হতে পারে এবং ষোড়শ শতকের "ঔদুম্বর সরকার" বলতে কয়েকটি পরগনার সমষ্টি হতে পারে। এগুলি জাতিনাম নয়, এগুলি

স্থান-নাম; কিন্তু যে জাতির নাম থেকে এই স্থাননামের উৎপত্তি, সেই সেই ঔডুম্বর বা ওডুম্বরী জাতি যদি প্রাচীন যুগের কোন জাতিনাম হয়ে থাকে এবং মধ্যযুগে যদি সেই জাতিনামের বিবর্তন ঘটে থাকে, তাহলে মধ্যযুগের আগে সেখানে তাদের অস্তিত্ব ছিল, এই সহজ-সত্য অস্বীকার করার কোন কারণ দেখা যায়না। প্লিনি কোন স্থান নির্দেশ না করে ওডুম্বরী নামক যে প্রাচীন জাতির কথা লিখেছেন, মধ্যযুগ থেকে বর্তমানেও ঐ জাতির অস্তিত্ব না থাকায়, তাদের অবস্থানক্ষেত্র সম্পর্কে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত—"প্লিনী যে ওডুম্বরী (Odomboeıae) জনপদ / জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধুনদের দক্ষিণে পশ্চিম-সাগরের উপকূলে বা সমীপবর্তী কোন স্থানে" তারা বাস করত। এ প্রসঙ্গে প্লিনির বিবরণ আলোচনা করা যাক—"সিন্ধু ও যমুনার মধ্যে পার্বত্য জাতিগুলি হল খস, ক্ষত্রিবনীয়, তারপর মাবেল, করোঞ্চ, পরসঙ্গ ও অসঙ্গ, এ সকল জাতি সিন্ধুদ্বারা অবরুদ্ধ এবং এদের চতুর্দিকে ৬২৫ মাইল পরিমিত স্থানব্যাপী পর্বত ও মরুভূমি। মরুভূমির পরে ধার ও শূর জাতি, তারপর আবার ১৪৭ মাইল পর্যন্ত মরুভূমি। এইসব মরুভূমির পরে মালতিকর, সিংহ, মরুহ, ররুঙ্গ ও মরুণ জাতি। এরা সমুদ্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদে সমান্তরালে অবস্থিত পর্বতমালায় বাস করে। তারপর নায়র, এদের চতুর্দিকে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ (Capitalia) অবস্থিত। তারপর ওরাতুর জাতি। এদের পরে বরতত্গণ এক রাজার অধীনে বাস করে। তারপর ওডুম্বরী, সলবস্ত্রা, হোরত, খর্মা। খর্মা-জাতির পরে পাণ্ড্য জাতি।" প্লিনির এই বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধুনদের অববাহিকায় পার্বত্য ও মরুভূমিময় অঞ্চলের নিকট ওডুম্বরীদের বাসস্থান আদৌ বোঝায় না, বরং সিন্ধুনদ থেকে অনেক দূরে দক্ষিণভারতে বোঝায়; কারণ সিন্ধু থেকে দক্ষিণে অনেকগুলি জাতিনামের পর ওডুম্বরী, তারপর আর তিনটিমাত্র জাতিনামের পরেই পাণ্ড্য অর্থাৎ মাদ্রাজের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ ভারত-ভূখণ্ডের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত। সুতরাং ক্রম-অনুসারে ধরতে গেলে পাণ্ড্যদের কিছু উত্তরে ওডুম্বরীদের জনপদ বোঝায়, কিন্তু কানিংহামের মতে, ওডুম্বরীরা ছিল কচ্ছের অধিবাসী। 'The Classical Accounts of India' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে পশ্চিমভারতে ওডুম্বরীদের অবস্থানের কথা উপরিউক্ত মন্তব্যে আলোচিত হয়েছে। আবার ডঃ বিমলাচরণ লাহার মতে ঐ স্থান মধ্যদেশে, পাঠানকোট অঞ্চলে, কুরুদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত (ডঃ অতুল সুরের মতে, কুরু ও পাঞ্চাল দেশ বঙ্গভূমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত)। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে রাজমহলের দক্ষিণে ঔডুম্বরিক; তিনি

অকাট্য প্রমাণস্বরূপ জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলি ও আইন-ই-আকবরীর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে প্রাচীন বাঙলার মানচিত্রেও তা দেখিয়েছেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর 'বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে প্রাচীন-বাঙলার মানচিত্রে ঐ একই স্থানে ঔদুম্বরিক জনপদকে দেখিয়েছেন। দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত স্নাতক শিক্ষার্থীদের এবং নবম, দশম. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য "মানচিত্রে ইতিহাস" নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট বঙ্গদেশ (প্রাচীনযুগ)-এর মানচিত্রেও অনুরূপভাবেই ঔদুম্বরিকের অবস্থান দেখানো হয়েছে। তাই আমি এই পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি যে, প্রাচীন-বঙ্গের মানচিত্রে উত্তর-রাঢ়ের উত্তরাংশ "ঔদুম্বরিক" হিসাবে পরিগণিত।

আবার এমনও হতে পারে যে, ঔদুম্বরিকদের বাসস্থান দুটি অঞ্চলেই ছিল, যেমন রামায়ণে পুণ্ড্রজাতির একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে দক্ষিণ-ভারতে গোদাবরী উপত্যকায় এবং অন্যটি অঙ্গদেশের সন্নিকটে অর্থাৎ মহাস্থানগড়ে। "নদীং গোদাবরী চৈব সর্ব্বমেবানুপশ্যত:। তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্॥" রামায়ণের এই বর্ণনামতে পুণ্ড্রদের একটি জনপদ ছিল অন্ধ্র, চোল, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি জনপদের নিকটবর্তী ; ঐ অঞ্চলে 'পুদুচ্চেরি' নামক একটি স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়, যে স্থান বর্তমান পণ্ডিচেরির নামান্তর। এই পুদুচ্চেরি ও পণ্ডিচেরি শব্দ পুদ্, পুড্ ও পুণ্ড্র শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, সম্ভবত ঐ স্থানেই একদা দক্ষিণভারতীয় পুণ্ড্রদের একটি জনপদ ছিল। আর "ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মল্লান্ কাশী কোশলান্। মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রস্ত্বঙ্গাংস্তথৈব চ॥" এই বর্ণনায় মগধ, মহাগ্রাম, অঙ্গ প্রভৃতি জনপদের নিকটে অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধনে পুণ্ড্রদের আরেকটি জনপদ একই রামায়ণীযুগে ছিল, একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তেমনভাবে দাক্ষিণাত্যের পুণ্ড্রজনপদের নিকটবর্তী স্থানে ঔদুম্বরদের একটি জনপদ ছিল এবং প্রাচীন বাঙলায় পুণ্ড্রদের অন্য জনপদের নিকটবর্তী রাঢভূমেও ঔদুম্বরদের আরেকটি জনপদ ছিল। সে হিসাবে পশ্চিমসাগরের উপকূলে বা সমীপবর্তী কোন স্থানে দক্ষিণভারতীয় ঔদুম্বরদের জনপদ ছিল বলে ডঃ ঘোষ যে অনুমান করেছেন, সে অনুযায়ী পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি জনপদের নিকটে প্লিনির বর্ণনার ক্রম-অনুযায়ী উক্ত জনপদ থাকলেও থাকতে পারে। ঐ অঞ্চলেই পূর্বসমুদ্রের দিকে ছিল দক্ষিণভারতীয় পুণ্ড্রদেরও একটি জনপদ। দক্ষিণভারতে পুণ্ড্রজনপদ থাকলেও, পূর্বভারতে আরেকটি পুণ্ড্রজনপদ একই সময়ে যেমনভাবে ছিল, ঠিক তেমনভাবে একই সময়ে ঐ পুণ্ড্র জনপদের পাশেই ছিল ঔদুম্বরিক জনপদ এবং তা ছিল

মধ্যযুগের আগেই প্রাচীন যুগে। সে হিসাবে বৃহত্তর রাঢ়ভূমে আমরা ঐ সময়ে মেগাস্থিনিস ও প্লিনি বর্ণিত একটি 'ওডুম্বরী' জনপদের সন্ধান পাচ্ছি।

২। ডঃ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাচীন বঙ্গের মানচিত্রে আমরা রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে ঔডুম্বরিক ও কঙ্কগ্রামভুক্তির মধ্যবর্তী স্থানে 'উত্তর-রাঢ়' এবং কঙ্কগ্রামভুক্তি ও বর্ধমান ভুক্তির মধ্যবর্তী স্থানে 'দক্ষিণ-রাঢ়ের' অবস্থান দেখতে পাই ; কিন্তু ভাগীরথীর পশ্চিমের বিশাল এলাকাকে আমরা বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের অন্তর্গত মনে করি। গঙ্গারিডির প্রবক্তা বিদেশী লেখকগণ কোথাও রাঢ নামের উল্লেখ করেন নি, তখন দেশ হিসাবে রাঢ় নামের প্রচলন ছিল বলে তদানীন্তনকালের কোন দেশীয় গ্রন্থেও উল্লেখ নেই। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ 'আয়রঙ্গসুত্তে' (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত সংস্কৃত 'আচারাঙ্গ সূত্র') মহাবীরের "ডুচ্চর (অর্থাৎ 'দুশ্চর') লাল" দেশ ভ্রমণের কথা আছে। কোন কোন গবেষকের মতে, এই 'লাল' শব্দ থেকে উত্তরকালে লাট, লাঢ এবং সর্বশেষে এই রাঢ নামের উৎপত্তি। রাঢ নামের অনেক আগে সুহ্ম, পুণ্ড্র, গঙ্গারিডি, লোহিতগঙ্গ, উন্মত্তগঙ্গ প্রভৃতি স্থাননামের ব্যবহার পাওয়া গেছে। তার অনেক পরে 'সুহ্ম' নামের পরিবর্তে একই স্থান হিসাবে 'রাঢ' নামের প্রয়োগ দেখা যায়। ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক রাঢের আযতন সম্পর্কে বলেছেন, "রাঢ়দেশ বা পাথুরে দেশ যে প্রায় সমগ্র ছোটোনাগপুর জুড়ে এবং সে অঞ্চলের সংস্কৃতি যে প্রায় রাঢী বা এক অখণ্ড সংস্কৃতি তা আমরা ভুলে যাচ্ছি।" সুতরাং উত্তর-কালের বৃহত্তর রাঢভূমি অর্থে আমরা রাজমহল থেকে তাম্রলিপ্তের দক্ষিণ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর এলাকা পর্যন্ত ধরব। এই এলাকার মধ্যেই যেমন আমরা ঔডুম্বরদের অস্তিত্বের সন্ধান পেলাম, তেমন প্লিনিবর্ণিত মল্ল (Malli)দের জনপদটিও আমরা বাঁকুড়া অর্থাৎ এই রাঢভূমের মধ্যেই পাই। প্লিনি যে গঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গীর কথা বলেছেন, বিশেষজ্ঞগণ তার রাজধানী পর্তেলিস্‌কে পূবস্থলী অথবা বর্ধমান বলে সনাক্ত করেছেন ; সে হিসাবেই ডঃ ঘোষ ঐ জনপদকে "গঙ্গার পশ্চিম তীরে" বলে মেনে নিয়েছেন। এ ছাড়া প্লিনির মধ্যকলিঙ্গও (Modogalingae) কোনমতেই গঙ্গার পূর্বদিকে হতে পারেনা, কলিঙ্গের অন্তর্বর্তী বৃহত্তম রাঢ়ভূমের মধ্যে হওয়াই সম্ভব ; সে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। প্লিনির Taluctae-কেও তিনি তাম্রলিপ্ত বলে স্বীকার করেছেন। প্লিনি লিখেছেন, ঐ তাম্রলিপ্তের রাজা ৫০,০০০ পদাতিক, ৪,০০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ হস্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখেন ; সুতরাং তাম্রলিপ্ত যে গঙ্গারিডির

বাইরে একটি পৃথক রাজ্য (State), এ কথা সুস্পষ্ট। আর তিনি যে গঙ্গারিদেস-কলিঙ্গীর কথা বলেছেন, তাদের রাজধানী পর্তেলিস্, কিন্তু গঙ্গারিডির রাজধানী গঙ্গা বন্দর। সুতরাং এদের সঙ্গেও মূল গঙ্গারিডিদের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। গঙ্গারিডি ও কলিঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উভয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল এই স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী।

"গঙ্গারিডি দেশ রাঢ, তাম্রলিপ্ত অঞ্চল বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গাঙ্গোপদ্বীপে অবস্থিত ছিল! তাহলে, প্লিনী (গঙ্গার পশ্চিমতীরে) গঙ্গারিডি-কলিঙ্গেয়ীর কথা বলতেন না, শুধু কলিঙ্গেয়ীর উল্লেখ করতেন"—ডঃ ঘোষের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শোয়ানবেক যেভাবে প্লিনির রচনার পাঠোদ্ধার করেছেন তা হল, "কলিঙ্গী নামে কথিত জনগোষ্ঠী ("The Tribes called Calingae") সমুদ্রের নিকটবর্তী এবং তার উপরে মন্দ্য ও মল্ল, যাদের দেশে মাল্লাস পর্বত, ঐসব এলাকার সীমানায় গঙ্গানদী। এর শেষাংশ গঙ্গারিডি (Gangarides)দের দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। কলিঙ্গের প্রধান নগর (রাজধানী) পর্তেলিস্ নামে অভিহিত (..Gangaridum. Calingarum Regia)"। সুতরাং সমুদ্রের নিকটবর্তী কলিঙ্গ, তার উপরিভাগে মন্দ্য ও মল্লদের দেশ এবং তারপর গঙ্গারিডিদের পাশে আবার এক 'কলিঙ্গ' (অর্থাৎ কলিঙ্গের একটি স্বতন্ত্র অংশ) যার রাজধানী পর্তেলিস্ (পূর্বস্থলী বা বর্ধমান, যা গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত)। প্লিনির এই কলিঙ্গই 'গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ' হওয়া স্বাভাবিক (গঙ্গার প্রাচীনতম ধারার পশ্চিমে বর্ধমান শহর, কিন্তু ঐ ধারার পূর্বদিকে পূর্বস্থলী শহরের অবস্থান বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে)। রজনীকান্ত গুহ, ম্যাক্রিণ্ডল, এফ. জে. মোনাহান প্রমুখ অধিকাংশ অনুবাদক ও ঐতিহাসিক শোয়ানবেক-লিখিত উপরিউক্ত পাঠ (Gangaridum. Calingarum Regia) গ্রহণ করেছেন, কিন্তু মতান্তরে, " .Gangaridum Calingarum. Regia ." এরূপ পাঠোদ্ধারের কথাও জানা যায়, এবং কেবলমাত্র এ ক্ষেত্রেই 'গঙ্গারিদেস কলিঙ্গী' কথাটি অনুমান করা হয়, যার দ্বারা প্লিনি শুধু "কলিঙ্গেয়ী" বলেছিলেন কি "গঙ্গারিডি-কলিঙ্গেয়ী" বলেছিলেন তা নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া যায় না। 'The Early History of Bengal' গ্রন্থের প্রণেতা ঐতিহাসিক F. J. Monahan লিখেছেন যে, প্লিনি ও টলেমির সাক্ষ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মেগাস্থিনিসের সময়ে এবং তার সমসাময়িক কালে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অধিবাসীরা গ্রীক পর্যটক ও লেখকদের কাছে গঙ্গারিডি (Gangarides) নামে পরিচিত ছিল; কিন্তু বংশগত, আচরণগত ও ভাষাগত বিষয়ে তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিল প্রতিবেশী কলিঙ্গবাসীদের সমগোত্র এবং সেই কারণেই তারা 'কলিঙ্গী' অথবা 'গাঙ্গেয়-কলিঙ্গী' নামে অভিহিত ছিল; এবং একদা যখন প্রাসী এই অঞ্চলের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য ভোগ করছিল, তখন তা গ্রীকদের কাছে 'প্রাসীদেশ' রূপে বিবেচিত হয়েছিল।

এফ. জে. মোনাহানের মন্তব্য থেকে আমরা অনুভব করতে পারি যে, গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ একদা প্রাসীর অধিকারভুক্ত হয়েছিল ; সুতরাং এই জনপদ কখনও গঙ্গারিডি, কখনও কলিঙ্গ এবং কখনও বা প্রাসীর অধিকারভুক্ত ছিল এ কথা আমরা অনুমান করতে পারি। তথাপি পৃথক রাজা, পৃথক রাজধানী, স্বতন্ত্র রাজ্য ও নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য এই জনপদ একটি পৃথক জাতি ও রাজ্যের (Kingdom) পরিচয় প্রদান করে। এই অঞ্চল যে উত্তরকালীন রাঢ় দেশের অন্তর্গত ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু মূল গঙ্গারিডি রাজ্য (State) অন্তত মেগাস্থিনিসের সময় পর্যন্ত কখনও কলিঙ্গ, প্রাসী বা অন্য কোন বিদেশীদের দ্বারা অধিকৃত হয়নি, একথা তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে লিখে গেছেন। সেদিক থেকেও গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ এবং গঙ্গারিডি-মূলরাজ্যের পার্থক্য সূচিত হয় ; যদিও এই উভয় রাজ্যের সৈন্যবল ছিল সমান-সমান।

"প্লিনীর বর্ণনা অনুযায়ী রাঢ়, তাম্রলিপ্ত অঞ্চলও নিঃসন্দেহে গঙ্গারিডি দেশ/জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল"—ডঃ ঘোষের এই মন্তব্যটিও যথার্থ্য নয়। কারণ, প্লিনি কলিঙ্গের মত তাম্রলিপ্তকেও প্রাসীর অন্তর্গত বলেছেন—"Pliny seems to regard Tamalites as being in the country of the Prasii, for when he says that it is seven days' sail from Ceylon to the country of the Prasii, he must mean to Tamralipti, not Pataliputra" (The Early History of Bengal—F. J. Monahan). তাহলে, প্লিনি মেগাস্থিনিসের বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়ে যে অভিমত প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তা হল—প্রাচীনতম গঙ্গাখাতের পশ্চিমপার অর্থাৎ বৃহত্তর রাঢ়ভূমি ও কলিঙ্গ ছিল প্রাসীর অধিকারে এবং পূর্বপার অর্থাৎ গাঙ্গোপদ্বীপ বা উপবঙ্গ ছিল গঙ্গারিডির অধিকারে, টলেমির মতেও এই রাজ্যের পশ্চিমসীমায় ছিল পশ্চিমদিকের প্রাচীন গঙ্গাখাত ক্যাম্বিসাম, আর পূর্বসীমায় ছিল পূর্বদিকের গঙ্গাখাত আন্তিবোলা অর্থাৎ পদ্মা-বুড়ীগঙ্গা-মেঘনা ধারা। ডিওডোরাসও প্রায় একই কথাই বলেছেন—Diodorus : "...the dominions of the nation of the Prasioi and Gangaridai...whose king had 4,000 elephants trained and equipped for war, beyond the Ganges ..." This accords with the statement of Curtius and Plutarch. There is however, another passage of Diodorus where it is stated that, "This river (Ganges)

which is 30 stades in width, flows from north to south and empties into Ocean, forming the boundary towards the east of the tribe of the Gangaridae who possesses the largest number of elephants 4,000 elephants equipped for war" (History of Bengal—R. C. Majumdar, Chapter III, Page—41) এখানে বলা হযেছে যে, এই গঙ্গানদী পূর্বদিকে (towards the east) গঙ্গারিডি "জনগোষ্ঠী"র ("tribe of the Gangaridae") সীমা নির্দেশ করছে। প্লিনির ন্যায় ডিওডোরাসও প্রাসী এবং গঙ্গারিডিকে পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠী (Tribe) ও রাজ্য (Dominion) বলতে চেয়েছেন, কিন্তু ঐ দুটি রাজ্য ও জনগোষ্ঠীকে একত্রে দেশ ও জাতি হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্লিনি আবার কলিঙ্গ এবং রাঢ়-ভূমের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জনপদের উপর প্রাসীর কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এঁরা উভয়েই নিজেদের অভিমত প্রতিষ্ঠার জন্য মেগাস্থিনিসের রচনা উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু কোন ঐতিহাসিক গঙ্গারিডিকে কলিঙ্গ অথবা প্রাসীর অন্তর্ভুক্ত বলেননি। সুতরাং গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে বাংলার নিম্নভূমি অঞ্চলেই অর্থাৎ কেবলমাত্র গাঙ্গেয় বদ্বীপগুলিতে নানা-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাজ্য (State) গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক ম্যাক্রিণ্ডলও এ বিষয়ে একই কথা বলেছেন—"বর্তমানে যা নিম্নবঙ্গ নামে অভিহিত, তখন মোটামুটিভাবে ঐক্যবদ্ধ সেই অঞ্চলে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারিদেসদের অধিকারে ছিল এবং সেখানকার বহু 'দেশীয় জনগোষ্ঠী' সংঘবদ্ধ হয়েছিল—('Ancient India as described by Megasthenes & Arrian', p. 136 দ্রষ্টব্য)। প্রাসী বা মগধের মত তারা সাম্রাজ্যবাদী ছিল না, অথচ তারা ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুসমৃদ্ধ—এটা গঙ্গারিডিদের একটা মহৎ গুণের পরিচয়। পুণ্ড্রনগরের আদর্শে তখন হয়ত এ অঞ্চলেও সমবায় প্রথার প্রচলন ছিল। গোষ্ঠীশাসন ব্যবস্থায় দলপতির অধীনে রাজ্য বা জনপদগুলির শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত। তাই কোন দেশীয় ও বিদেশী গ্রন্থে এ সময়ে এ অঞ্চলের কোন রাজা বা রাজবংশের পরিচয় মেলেনা। প্লিনি বর্ণিত শতাধিক ভারতীয় জাতির প্রত্যেকটিই এক-একটি কৌমজনগোষ্ঠী (Race or Tribe); তার মধ্যে প্রাসী-জনগোষ্ঠীর অধিকারে ছিল গঙ্গার পশ্চিমের বৃহত্তর অঞ্চলের রাজ্যসমূহ। আর, গঙ্গারিডি-জনগোষ্ঠীর অধিকারে ছিল উপবঙ্গের গাঙ্গেয়-বদ্বীপগুলি এবং তা ছিল একটিমাত্র রাজ্যে সীমাবদ্ধ। মেগাস্থিনিস থেকে টলেমি

পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কুষাণ যুগ পর্যন্ত এই রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

আমরা রাঢ়ভূমের মধ্যে (গঙ্গার পশ্চিমে সমুদ্রকূল পর্যন্ত) প্লিনিবর্ণিত 'ঔদুম্বরিক, মল্ল, গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, মধ্যকলিঙ্গ প্রভৃতি পৃথক পৃথক জনপদ বা রাজ্যগুলির অস্তিত্বের কথা আলোচনা করলাম, যেগুলি প্রাসীর অধিকারভুক্ত ছিল। এগুলি বাদ দিয়ে গঙ্গার শেষাংশ বলতে গাঙ্গোপদ্বীপ অঞ্চলই বোঝায়। "গঙ্গার শেষাংশে গঙ্গারিডি" একথা বলেছেন মেগাস্থিনিস, প্লিনি, সলিনাস, টলেমি প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ। আর, "গঙ্গাসাগর সেযুগে অনেক উত্তরে" ছিলনা, তার প্রমাণ বর্তমান নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাচীন বসতিস্তরের প্রত্নসম্পদগুলি। সেযুগে গঙ্গাসাগর যদি "অনেক উত্তরে" থাকত, তাহলে তার দক্ষিণে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বসতিস্তর আবিষ্কার সম্ভব হত না। প্লিনি, ডিওডোরাস প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ প্রত্যেকেই গঙ্গারিডির কথা বলেছেন এবং নিজেদের অভিমতের যথার্থতা প্রমাণের জন্য মেগাস্থিনিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক প্রাসী (কলিঙ্গসহ) ও গঙ্গারিডিকে যৌথভাবে গাঙ্গেয়-যুক্তসাম্রাজ্য (কনফেডারেশন) হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার যুক্ত-রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র এবং প্রাক্-মৌর্যযুগে তার অধিকর্তা ছিলেন মগধসম্রাট ধননন্দ (ক্সান্দ্রামেস বা এ্যাগ্রামেস)। 'সে হিসাবে গঙ্গারিডি' বলতে বৃহত্তর-বঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বঙ্গ (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ)-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের ব্যাপক অঞ্চলকে বোঝায়। কিন্তু কোন মৌর্য রাজা গঙ্গারিডি-যুক্তসাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন বলে জানা যায় না ; সুতরাং কেবলমাত্র ধননন্দের সময়ে গঙ্গারিডি-যুক্তসাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, তারপর থেকে কুষাণযুগ পর্যন্ত গঙ্গারিডি ছিল একক স্বাধীনরাজ্য এবং তা ছিল গাঙ্গোপদ্বীপে সীমাবদ্ধ। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর 'History of Bengal—I (Dacca University থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থে বলেছেন যে, গঙ্গারিডি গঙ্গাভাগীরথীর পূর্ব দিকে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল এবং প্রাসী গঙ্গাভাগীরথীর পশ্চিমে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। তাই ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁকে সমর্থন ক'রে, তাঁর সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত'রূপে অভিহিত ক'রে, গুণীজনের প্রতি গুণীজনসমুচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন—"ডিওডোরাস-কার্টিয়াস-প্লুটার্ক-সলিনাস-প্লিনি-টলেমি-স্ট্রাবো প্রমুখ লেখকগণের প্রাসঙ্গিক মতামতের তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা ক'রে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দেখিয়েছেন যে, গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্র গঙ্গা-

ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল, এবং প্রাচ্যরাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমদিকে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্ত যে প্রাচ্যরাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল. এটাও তাঁরই অনুমান। রায়চৌধুরী মহাশয়ের এই অনুমান যুক্তিসম্মত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করা যেতে পারে" (বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, পৃ: ৪৬২—৪৬৪)।

৩। ডঃ ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় মন্তব্যে 'টলেমির ত্রুটি' সম্পর্কে আমার বক্তব্য—টলেমি নাবিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুশীলনের সাহায্যে মানচিত্র প্রণয়ন পূর্বক অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সহযোগে পৃথিবীর আট হাজার বিখ্যাত স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় করেছেন। ঐ মানচিত্রে আমরা গঙ্গামোহনাগুলির অবস্থানক্ষেত্র, গঙ্গারিডি রাজ্য ও তার রাজধানী গঙ্গেবন্দরের উল্লেখ পাই। ইতঃপূর্বে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এমন খুঁটিনাটিভাবে মানচিত্র সহযোগে সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট স্থানসমূহ নির্ণীত না হওয়ায়, প্রাথমিক প্রচেষ্টায় টলেমিকৃত মানচিত্রে স্থানসমূহের দূরত্ব কমবেশী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। একই কারণে টলেমির মানচিত্রে ভারতবর্ষের আকৃতিও অবিকল হতে পারেনি এবং গ্রীক উচ্চারণে এদেশীয় স্থাননামগুলি বিকৃত হওয়ায় সনাক্তকরণ দুরূহ ও অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই খুঁটিনাটি বিচারে টলেমির ম্যাপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া যায় না একথা ঠিক, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ইতিহাসের বহু হারিয়ে-যাওয়া তথ্য এই ম্যাপের সাহায্যেই উদঘাটিত হচ্ছে। ডঃ অতুল সুর মহাশয় টলেমি-উল্লিখিত 'সিত্রিযাম' শব্দটি থেকে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের সন্নিকটে 'শিবিপুরম্' নামক নগরটিকে সনাক্ত করেছেন এবং বেস্‌সান্তর-জাতকে বর্ণিত প্রাচীন শিবিরাজ্যের অবস্থানের বাস্তবতা উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। তাম্রলিপ্তের পাশ দিয়ে গঙ্গার প্রাচীনতম ধারাটি যে একদা রাজমহল-সরস্বতী-কংসাবতী (ক্যাম্বিসাম্) পথে সাগরে পড়ত এবং পদ্মা-মেঘনা ধারার অস্তিত্বও টলেমির সময়ে ছিল, তা তাঁর ম্যাপ থেকেই অনুভব করা যায়। 'ক্যাম্বিসাম' থেকে 'আন্তিবোলা' পর্যন্ত গঙ্গামোহনা-অঞ্চলের যে দূরত্ব তিনি দেখিয়েছেন, বর্তমান কংসাবতী-হলদী মোহনা থেকে পদ্মা-মেঘনা পর্যন্ত অঞ্চলের দূরত্বও তদনুরূপ। তাই ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেছেন যে, যদিও পূর্বভারতের মানচিত্রের কোন সঠিক ধারণা টলেমির ছিল না, তবুও তিনি নিশ্চয় শুনেছিলেন যে গঙ্গার পশ্চিমতম মুখ থেকে পূর্বতম মুখের দূরত্ব যথেষ্ট; তিনি দুটির মধ্যে চার ডিগ্রির তফাৎ দেখিয়েছিলেন, হুগলীর মোহনা থেকে পদ্মা-মেঘনার মোহনার (যার সীমার মধ্যে থাকতে পারে

চট্টগ্রামের নিকটবর্তী জলরাশি) দূরত্ব প্রায় অনুরূপ। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও টলেমির মানচিত্র বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ; কিন্তু তাঁর 'বাংলার নদনদী' প্রসঙ্গে টলেমি বর্ণিত গঙ্গার পঞ্চমোহনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায়, তার সম্ভাব্যতার বিষয়কে অস্বীকার করেননি। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও টলেমিবর্ণিত গঙ্গামোহনাগুলির সনাক্তকরণে যথেষ্ট অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। ইতিহাসের শক্তমানুষ ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ও গঙ্গাসাগরে টলেমিবর্ণিত 'গঙ্গানগরের' অবস্থান বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। এমনভাবে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলিতে টলেমির বিবরণ ও মানচিত্রের বিষয় উদ্ধৃত করে সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ অনেকক্ষেত্রে নিজেদের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ; সুতরাং টলেমির বিবরণ ও মানচিত্র গবেষকগণ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়নি, সম্ভাব্য বিষয়সমূহ পণ্ডিতগণ কর্তৃক বহুলাংশে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গত এখানে মেগাস্থিনিসের বিবরণের তুলনা করা যেতে পারে। বিশিষ্ট গ্রীকভাষাবিদ ও ইতিহাসপ্রেমী রজনীকান্ত গুহ অনূদিত 'মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ' (পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯১, পৃঃ ৪৪—৪৬) থেকে এ বিষয়ে ডঃ শোয়ানবেকের মন্তব্য জানা যায়—"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহারা পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গুণাগুণ বিচার করিতে যাইয়া প্রাচীন গ্রন্থকারগণ মেগাস্থেনীসকে নিঃসন্দেহরূপে মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসাযোগ্য লেখকশ্রেণীতে পরিগণিত করিয়াছেন ; ......মেগাস্থেনীসের নিন্দুকগণের মধ্যে এরাটস্থেনীস প্রধান, এবং স্ট্রাবো ও প্লিনি তাঁহার সহিত একমত। অপরাপর লেখকগণ—ডায়োডোরস তাঁহাদিগের মধ্যে একজন—মেগাস্থেনীস লিখিত অনেক স্থান বর্জন করিয়াছেন ; তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহারা এই সকল স্থলে তাঁহাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই। স্ট্রাবো বলেন—'এযাবৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী ; ডীমখস ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথম ; তাঁহার নীচেই মেগাস্থেনীসের স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। ...ডীমখস ও মেগাস্থেনীস একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য। ইঁহারা নানা অলৌকিক জাতির উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। কোন জাতির কর্ণ এত বৃহৎ যে তাহাতে শয়ন করা যায় ; কোনটির মুখ নাই ; কোনটি নাসাবর্জিত ; কোনটি একচক্ষুঃ ; কোনটির পদ উর্ণনাভের পদের ন্যায় ; কোনটির লাঙ্গুল পশ্চাদ্দিকে। ...স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা, কীলকাকার মস্তকবিশিষ্ট নরপশু (Pans)...ইত্যাকার অনেক গল্প ইঁহাদিগের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ;

...এই তো তাঁহাদিগের ভারতবাসের স্মৃতিলিপি, উহা রাখিয়া যাইবার কি আবশ্যকতা ছিল বুঝিতে পারিতেছি না।' .....এই সমালোচকগণের এবম্প্রকার উক্তি পাঠ করিলে মনে হইতে পারে, ইঁহারা মেগাস্থেনীসের সত্যবাদিতায় সম্পূর্ণরূপে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশই স্বীয় স্বীয় পুস্তকে উদ্ধৃত করিতেন না।" মেগাস্থিনিস মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তিনি তথ্য-সংগ্রহকালে যা দেখেছিলেন এবং যা-যা শুনেছিলেন, তাঁর বিবরণে সে সব উল্লেখ করেছিলেন। আর্য-ব্রাহ্মণরা অনার্যদের নাগ, পক্ষী, বানর, রাক্ষস প্রভৃতি অস্বাভাবিক আকৃতির কথা প্রচার করত এবং নানা অলৌকিক জীবের কল্পনা করত। শোনা কথা যাচাই না করে তিনি সে সব অবিজ্ঞান-সম্মত উদ্ভট বিষয় নির্বিচারে লিপিবদ্ধ করায় এই বিপত্তি, কিন্তু সেই অবাস্তব বিষয়গুলি বাদ দিলে, বাকী অংশ এদেশের ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে তৎকালীন ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উপাদানে পরিপূর্ণ। মেগস্থিনিস বর্ণিত ভারতের মোট একশত আঠারোটি জাতির মধ্যে প্লিনি একশত একটি জাতির নাম গ্রহণ করেছেন, [অনবধানতা বশতঃ এই পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় তার মধ্যে 'Galmodroesi' নামক একটি জাতির নাম বাদ পড়েছে, ঐ নামটি 'Uberae' নামের পরে এবং '*Preti*' নামের আগে বসবে] এবং অন্যান্যগুলি বাদ দিয়েছেন। মেগাস্থিনিসের মতে সিন্ধু থেকে গঙ্গার মোহনার দূরত্ব ষোল হাজার স্টাডিয়াম। তিনি দেখেছিলেন, সিন্ধু থেকে পাটলিপুত্র দশ হাজার স্টাডিয়াম এবং নাবিকদের কাছে শুনেছিলেন যে পাটলিপুত্র থেকে গঙ্গামোহনা ছ'হাজার স্টাডিয়াম, কিন্তু গঙ্গামোহনা থেকে সিন্ধুনদের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকৃত দূরত্ব তেরো হাজার সাত শ স্টাডিয়াম—এমন উদাহরণ আরো আছে। তথাপি, এ ধরণের ব্যবধানগত ভ্রান্তির জন্য টলেমির মত মেগাস্থিনিসকেও কোনমতে দায়ী করা যায় না। ভারতীয় স্থাননামের গ্রীকবিকৃতি মেগাস্থিনিস ও টলেমির ক্ষেত্রে একই ধরণের অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। এ সব সত্ত্বেও মেগাস্থিনিসের মত টলেমির মানচিত্র ও ভূগোল-বিবরণের "প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং এই বিবরণ বহু মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সরবরাহ করেছে"—বিশেষজ্ঞগণের এই স্বীকারোক্তিও ডঃ ঘোষ মহাশয় তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্যে উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং এ ধরণের ত্রুটি-গুলির জন্য আমরা টলেমির মানচিত্র ও ভূগোল-বিবরণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারি না। একইভাবে, আমরা ঐ কারণে মেগাস্থিনিসের বিবরণকে উপেক্ষা করে 'গঙ্গারিডি' বিষয়কে অস্বীকার করতে পারি না; কারণ

"মেগাস্থেনীসই সর্বপ্রথম ভারতবাসীদিগের জীবন সর্ববিভাগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেন ; এবং গ্রীকদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই ভারতবাসিগণের রাজনীতি ও ধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্রতম বিষয় পর্যন্ত সমুদয় বিশদরূপে বর্ণনা করেন। ...মেগাস্থেনীস কেবল নিজের গুণে আদরণীয় নহেন, তাঁহার অন্যবিধ গুরুত্বও বর্তমান রহিয়াছে। তাহা এই যে, পরবর্তী লেখকগণ তাঁহার গ্রন্থের বহু স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন"—ডঃ ই. এ. শোয়ানবেক ('মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ'—রজনীকান্ত গুহ, পুনর্মুদ্রণ-১৩৯১, পৃঃ ৩১ ও ৫৩ দ্রষ্টব্য)।

উপরিউক্ত আলোচনাসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, "গঙ্গারিডি কেবলমাত্র গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল" এই অভিমত শুধু "টলেমির ভৌগোলিক বিবরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল" নয়, অথবা কারুর "স্বকপোলকল্পিতও" নয়—এই অভিমত প্রাচীন ও আধুনিককালের ঐতিহাসিকগণের মতামত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মূল্যবান ফসল। 'টলেমির বর্ণনা অনুযায়ী গঙ্গার তুটি মুখ ভাগীরথী-আদিগঙ্গার পশ্চিমে পড়ে—এ কথা আমি সমর্থন করি। তার মধ্যে প্রথম মুখ 'ক্যাম্বিসাম্' অর্থাৎ প্রাচীন সরস্বতী-কংসাবতীর মোহনা বা বর্তমান 'হলদী'-মুখ ; আর দ্বিতীয় মুখটি হল 'ম্যাগনাম্' অর্থাৎ উত্তরসরস্বতীর মোহনা বা বর্তমান হুগলী-মুখ। এর পূর্বদিকে তৃতীয় মুখ 'কাম্বেরিকাম্' বা গঙ্গাসাগর সঙ্গম অর্থাৎ ভাগীরথী-আদিগঙ্গার মোহনা বা বর্তমান ধবলাট-মুখ। টলেমির মতে এই তিনটি মুখ গঙ্গার একই শাখান্তর্গত। অপর শাখায় চতুর্থ ও পঞ্চম তুটি মুখ—চতুর্থটি হল 'সিউদোস্তমাম' অর্থাৎ মধুমতী-হরিণঘাটার মোহনা এবং পঞ্চম মুখটি হল 'আন্তিবোলা' অর্থাৎ পদ্মা-বুড়ীগঙ্গা-মেঘনার মোহনা। বলা বাহুল্য, উক্ত শাখাতুটি যথাক্রমে ভাগীরথী-শাখা এবং পদ্মা-শাখা। এ বিষয়ে আমি এই পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠায় সবিশেষ আলোচনা করেছি।

৪। ডঃ ঘোষ মহাশয়ের চতুর্থ মন্তব্য প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে প্রাসী অপেক্ষা গঙ্গারিডির আয়তন কম প্রতিপন্ন হলেও, তা "সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর" পরিচায়ক নয় এবং তাতে "গবেষণার মহত্ব ও মান" ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং, 'প্রাসী'র মত অন্যান্য রাজ্যগুলিকে কুক্ষিগত করে, সাম্রাজ্যবাদী বিশাল রাষ্ট্র হিসাবে গঙ্গারিড়িকে পরিচিত করার "স্বকপোলকল্পিত" মন্তব্যে "সত্য এবং তথ্য তুইই অস্বীকার করার প্রবণতা" পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটনে আমাদের কোনরূপ অন্যায় আবেগের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

৫। এবার আমার আলোচ্য বিষয় পঞ্চম অর্থাৎ শেষ মন্তব্যটি সম্পর্কে। সাক্ষাৎ-পরিভ্রমণের ফলে মেগাস্থিনিস কাবুল নদী ও পঞ্চনদের প্রবাহগুলি সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ প্রদানে সক্ষম হয়েছেন। ঐ অঞ্চল পর্যটনের পর তিনি রাজপথ ধরে পাটলিপুত্র পর্যন্ত পৌছান, কিন্তু নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল প্রত্যক্ষ না করায় তিনি গঙ্গামোহনাগুলি সম্পর্কে যথাযথ বর্ণনা দিতে পারেননি। লোকশ্রুতির মাধ্যমে তিনি নিম্নগঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন—এ কথা মেগাস্থিনিস নিজেই স্বীকার করেছেন। সেজন্য, মেগাস্থিনিসের বিবরণে গঙ্গা-নগরের নাম পাওয়া যায়না এবং একই কারণে, টলেমির বিবরণে পর্তেলিসের নাম পাওয়া যায়না। তাই বলে, মেগাস্থিনিসের সময়ে গঙ্গানগরের অস্তিত্ব ছিলনা এবং টলেমির সময়ে পর্তেলিসের অস্তিত্ব ছিলনা —এ কথা সঠিক-ভাবে বলা যায়না। টলেমি গঙ্গানগরকে গঙ্গারিডি রাজ্যের (গাঙ্গোপদ্বীপের) প্রধান নগর ও রাজধানীরূপে উল্লেখ করেছেন, গঙ্গারিডিদের রাজা (দলপতি) এই গঙ্গানগরে বাস করতেন—একথাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। গঙ্গার পাঁচটি প্রসিদ্ধ মুখের মধ্যে পশ্চিমদিক থেকে আরম্ভ করে তৃতীয়-মুখ 'কাম্বেরিকাম্', অর্থাৎ 'আদিগঙ্গার মোহনা' ছিল প্রধান মুখ। তার পশ্চিমতীরে অর্থাৎ প্রাচীন গঙ্গাসাগর-তীর্থনগরে তিনি এই গাঙ্গেয়-সমুদ্রবন্দরের অবস্থান নির্দেশ করেছেন (টলেমির ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। দেবতাজ্ঞানে গঙ্গাপূজা ও পুণ্যতীর্থরূপে গঙ্গাসাগরের খ্যাতির কথা অতি প্রাচীন কাল থেকে জানা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গাকে দেবীরূপে এবং গঙ্গাসাগরকে পুণ্যতীর্থরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতবাসীরা "গঙ্গানদীর পূজা করে" এ কথা স্ট্রাবো তার 'জিওগ্রাফিকন্' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন, সুতরাং স্ট্রাবোর সময়ে গঙ্গানদীর পূজা চলত এবং সেই গঙ্গানদী যে 'ভাগীরথী-আদিগঙ্গা' তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর টলেমি তাঁর ম্যাপে গঙ্গাসাগর তীর্থনগরকেই গঙ্গানগররূপে চিহ্নিত করেছেন। দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর এবং সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা পর্যন্ত স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুরাকীর্তিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ায়, গঙ্গারিডিদের আমলেও বর্তমান গঙ্গাসাগরের অস্তিত্ব ছিল, একথা এখন আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

গ্রীক অভিযানের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের তিন শতাধিক বৎসর আগে থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত, বঙ্গভূমির এই পাঁচশ বৎসরের ইতিহাস দেশীয় গ্রন্থাদি থেকে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, কিন্তু গ্রীক ও রোমক লেখকগণ ব্যতীত, চৈনিক লেখকগণের বিবরণ থেকেও আমরা ঐ সময়ে 'গঙ্গা' জনগোষ্ঠী ও 'গঙ্গা' জনপদের পরিচয় পাই।

প্রথম শতকে চীনের সঙ্গে এই 'গঙ্গা' জনপদের অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য-যোগাযোগের কথা 'ছিএন্ হান্-সু' নামক চৈনিক গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ঐ একই সময়ে (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) গ্রীকভাষায় রচিত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে 'গঙ্গা' একাধারে একটি নদী, একটি জনপদ ও একটি হাট-শহরের নাম হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। এই অতুলনীয় গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। কারণ, একজন নাবিক বাণিজ্য উপলক্ষে যে যে বন্দরে অবতরণ করেছিলেন, সেই সেই স্থানের যাত্রাপথ ('পেরিপ্লাস'-এর অর্থ 'পথনির্দেশিকা') ও আনুষঙ্গিক বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, সুতরাং এই বিবরণ ছিল প্রত্যক্ষদর্শীর নিখুঁত ও যথার্থ বিবরণ। তিনি প্রধান-গঙ্গাপ্রবাহের তীরবর্তী স্থানে গঙ্গানগরের কথা উল্লেখ করেছেন। 'ভাগীরথী-আদিগঙ্গা' ঐ সময়ে গঙ্গার প্রধান প্রবাহরূপে পরিচিত ছিল। তিনি ঐ সময়ে উক্ত প্রধান গঙ্গা-মোহনা অঞ্চলে 'গঙ্গা' নামক জনপদ বা রাজ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সুতরাং তিনি 'গঙ্গাসাগর' অর্থাৎ সমগ্র সাগরদ্বীপ ও তার সন্নিহিত অঞ্চলকে 'গঙ্গা' জনপদ বা রাজ্য হিসাবে পরিজ্ঞাত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, এখানকার প্রধান নদীপ্রবাহের নাম 'গঙ্গা', তার তীরের হাট-শহরটির নাম 'গঙ্গা' এবং এখানকার জনপদ বা রাজ্যের নামও 'গঙ্গা'। ঐ সময় এদেশের 'দেবী সুরেশ্বরী ভাগীরথী'-আদিগঙ্গাকেই তিনি ভারতের প্রধান নদী 'গঙ্গা'রূপে জ্ঞাত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কারুর দ্বিমত থাকতে পারে না, আর গঙ্গাসাগর তীর্থনগরটিকে তিনি 'গঙ্গা' নগররূপে জ্ঞাত হয়েছিলেন, কারণ তৎকালে গঙ্গাসাগরসঙ্গমের বিখ্যাত তীর্থমেলা হিসাবে একমাত্র 'গঙ্গাসাগর' নামটিই সর্বজনবিদিত ছিল। গঙ্গার মোহনায় সাগরকূলে, অর্থাৎ আদিগঙ্গার কূলে 'গঙ্গা'-শব্দযুক্ত সুবিখ্যাত স্থাননাম একমাত্র এই 'গঙ্গাসাগর।' অন্য কোনস্থান কোন যুগে কোন কালে শ্রীরাম 'গঙ্গাসাগর' নামে অভিহিত হয়নি, আর হবেও না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, আদিগঙ্গা মজে গেলেও, তার গতিপথে পুষ্করিণী ও খালবিলগুলি আজও তীর্থস্নানের ঘাট হিসাবে পরিগণিত এবং সে সব স্থানের জল পবিত্র গঙ্গাজল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং তৎপার্শ্ববর্তী শ্মশানক্ষেত্রগুলির প্রসিদ্ধি আজও বেড়েই চলেছে। সুতরাং স্রোতোধারার পরিবর্তন ঘটলেও তীর্থস্থানগুলি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তা না হলে, আদিগঙ্গা মজে যাওয়ার এত দিন পরেও তীর্থঘাটগুলি অপরিবর্তিত থাকত না। মহাত্মা ভগীরথ ভাগীরথী-আদিগঙ্গা খাতের সংস্কার সাধন করে এ দেশের অশেষ উপকার সাধন করায়, দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও পূজা পেয়ে আসছেন (গঙ্গাদেবীর মূর্তির সঙ্গে ভগীরথের মূর্তিও

স্থাপিত হয় ; গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দিরে, কপিলমুনির পাশে সগর রাজার ও গঙ্গাদেবীর সঙ্গে ভগীরথের নিত্য পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয় এবং পৌষ-সংক্রান্তিতে সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পূজায় সামিল হন)। অন্যপক্ষে, রাজমহল-সরস্বতী-কংসাবতী খাতটি আরো প্রাচীন, এবং তা ভগীরথের স্মৃতিবিজড়িত নয় বলেই 'আদিগঙ্গা ভাগীরথী' হিসাবে পরিগণিত নয়।

যাহোক, গঙ্গারিডি-ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি বিচার-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—পেরিপ্লাসে উল্লিখিত আদিগঙ্গার দক্ষিণাংশে অবস্থিত 'গঙ্গা' জনপদ গঙ্গারিডি-জনগোষ্ঠীর মূল বাসভূমি ছিল। টলেমির সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, গঙ্গামোহনাগুলির অন্তর্বর্তী সমগ্র দেশ অর্থাৎ উপবঙ্গ বা গাঙ্গোপদ্বীপ ঐ গঙ্গারিডিদের অধিকারভুক্ত ছিল এবং তাদের প্রাণকেন্দ্ররূপে নিজস্ব রাজধানী গঙ্গাবন্দরকে অবলম্বন করে তারা ঐ স্বাধীন দেশের সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। এই দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে বিদেশীদের কাছে গঙ্গারিডি জাতি (Nation) নামে পরিগণিত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের সময় এই গঙ্গারিডি ও প্রাসী নামক দুটি দেশকে মগধসম্রাট ধননন্দের অধীনে সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিক ডিওডোরাস ও কার্টিয়াস রুফাস। প্রাসী-অধিকৃত তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ প্রভৃতিকেও এই গঙ্গারিডি-কন্‌ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে মেগাস্থিনিস গঙ্গারিডি জাতির রাজা বলে উল্লেখ করেননি ; কিন্তু প্লুটার্ক লিখেছেন (সেকেন্দরের জীবনী, ৬২ অধ্যায়) ছ লক্ষ সৈন্য নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র ভারত জয় করেন। "তবে সমগ্র বাংলাদেশ যে মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, তার সপক্ষে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই" (ডঃ অতুল সুর : বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন', পৃঃ ২৮)। হয়ত সাময়িকভাবে চন্দ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্বকে প্রায় সারাদেশ স্বীকার করেছিল। মহারাজ অশোকের আমলে কলিঙ্গ অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চল আবার মগধের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এসেছিল ; কিন্তু পূর্বাঞ্চলে পুণ্ড্রবর্ধনে কুষাণ যুগ পর্যন্ত গঙ্গারিডি রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। যাহোক, ব্যাপক অর্থে বৃহত্তর গঙ্গাভূমি বা গঙ্গারিডি বলতে গঙ্গার সমগ্র অববাহিকা অঞ্চলকেই বোঝায়, এ কথা আমি ইতঃপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। সে হিসাবে বৃহত্তর বঙ্গদেশের অধিবাসী আমরা সকলেই সেই গাঙ্গেয় মহাজাতির উত্তরাধিকারী।

উপসংহার

বৃহত্তর গঙ্গাভূমি বা গঙ্গারিডির ইতিহাস সমগ্র পূর্ব ভারতের ইতিহাস, অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গ তথা বাঙালী মহাজাতির ইতিহাস। শৌর্যবীর্যে সমুন্নত বৃহত্তর গঙ্গাভূমির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস মহাভারত অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক; বেদব্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী মহাভারতের ঘটনাপ্রবাহের বহুলাংশ সংঘটিত হয়েছে এই গঙ্গাভূমির অভ্যন্তরে। গঙ্গারিডির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য এই বিশাল অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক, প্রাকৃতিক. প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়সমূহের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। এক কথায় বৃহদ্বঙ্গের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনতিবিলম্বে প্রনয়ণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে শ্রমবিমুখ, রণবিমুখ, ঐক্যবিমুখ জাতি হিসাবে পরিগণিত বাঙালীদের অতীতগৌরবের অধ্যায়গুলি উন্মোচিত হলে তারা হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রেরণালাভ করতে পারে। ঋষি বঙ্কিমের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আত্মবিস্মৃত বাঙালীর ইতিহাসচর্চা বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে এখন তার 'ইতিহাসবিমুখ' বিশেষণটিকে আপাতত সরিয়ে রাখা যায়। আত্মবিস্মৃতি আত্মহত্যারই নামান্তর। সেই আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমগ্র বাঙালী জাতিকে ইতিহাস-সচেতন করে তুলতে হবে। সেদিক থেকে ইতিহাস-সাহিত্যের ভূমিকা সর্বাধিক। ইতিহাস-অনুরাগী লেখকবর্গকে সেই দায়বদ্ধতার কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

দেশের অধিকাংশ মানুষ পল্লীবাসী, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের। গ্রামবাংলার মাটির কথা এবং সেই মাটির কাছাকাছি মানুষদের বাস্তব কাহিনী প্রত্যক্ষ করতে হলে প্রকৃত ঐতিহাসিককে প্রাসাদনগরীর উচ্চাসন থেকে নেমে আসতে হবে উপকূলবঙ্গের সমানুভূতির মাটিতে, গঙ্গাসাগরের পবিত্র উদারতায় মনকে অভিসিক্ত করে সব সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে ফেলতে হবে। বৈদিক আর্যদের ব্রাহ্মণ্যবিধানের প্রভাবে জাতীয় ঐক্যের মূলে বর্ণবৈষম্যের গাঢ় কালিমা যতই লেপিত হোক, আভিজাত্য-গরিমায় বিভূষিত হতে পেরেছে শিখর থেকে সমুদ্র, 'বিরাটপুরুষ হিরণ্যগর্ভের মাথা থেকে পা' পর্যন্ত— যে আভিজাত্যবোধে সমাজের নিম্নকোটির মানুষও তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর অস্তিত্বের ধারণায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং পরস্পরকে অবজ্ঞা করে। এই বিভেদনীতিকে সামাজিক আত্মহননের প্ররোচনা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সেই আভিজাত্যের সংবিধানে কালোর মধ্যে ভালোর অস্তিত্ব অস্বীকৃত, যার ফলে দীর্ঘ-অভ্যাসে কালো তার নিজের ভালোকে, প্রকৃত স্বরূপকে ভুলে যেতে বসেছে। মেষপালের মধ্যে প্রতিপালিত সিংহশিশুকে তার স্বরূপ চেনাতে

পারে শুধু মেষপালক ও তার স্বজাতি পুরুষসিংহ। বর্তমান ঐতিকহাসিক-গণকে কর্তব্যপরায়ণ মেষপালক ও পুরুষসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কালো যে কখনও ভালো হতে পারে তা বোঝানর জন্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে যে তারা এক সময় সত্যিই ভালো ছিল। তাহলে তারা আবার ভালো হতে পারবে না কেন? নিজেদের মনে এই প্রশ্নের উদ্ভব হলে এবং প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হলেই তারা সহজে ভালো হতে পারবে।

যা কিছু ভালো তার সবটাই তথাকথিত উচ্চবর্ণের অবদান, আর ম্লেচ্ছ, দাস, দস্যু, অসুর, রাক্ষস, নাগ, বানর, পক্ষী হিসাবে বর্ণিত এদেশের প্রাচীনবংশীয়েরা যতরকম অপকৃষ্টির মূলে, এবং তাদের বংশধররাই এই নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী শূদ্র (অবশ্য, ডারউইনের থিওরি অনুসারে মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই বানরজাতীয় প্রাণীর বংশধর), আবহমানকাল যাদের উপর সমাজের ভরণপোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত—এ ইতিহাস যে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, সেই সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এদের স্বরূপ চিনবার ও চেনাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আজকের ঐতিহাসিকদের ; আর সেজন্য ঐতিহাসিকগণকে সর্বতোভাবে এই মাটির কাছাকাছি মানুষদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। তবেই একদিন প্রকৃত ইতিহাস উন্মোচিত হবে এবং ভুলে ও মিথ্যায় ভরা ইতিহাসের তথ্যগুলি অপনোদিত হবে। সেই সহযোগিতার কাজে এ পর্যন্ত মাটির কাছাছি থেকে শ্রমজীবী-কৃষিজীবী পরিবারের অতি নগণ্যসংখ্যক কিছু মানুষ তাঁদের নিজেদের এলাকার সংস্কৃতি অনুশীলনে ব্রতী হতে পেরেছেন। দুর্গম এলাকা থেকে নিজনিজ কর্মব্যস্ততায় ব্যাপৃত থেকেও, অজস্র সমস্যা ও বিপত্তির মধ্যে এসব কাজ করা কতখানি দুরূহ, তা আমি ভুক্তভোগী হিসাবে সম্যগরূপে জানি। তবুও এই গ্রামবাংলার বৃহৎ এলাকা থেকে এক এক অঞ্চলের মানুষ যদি একান্ত অধ্যবসায়ে তাঁদের আঞ্চলিক-ইতিহাসের মূল্যবান বাস্তব উপাদানগুলির যতটুকু সম্ভব সংগ্রহ করে যেতে পারেন, তাহলে অনেকের সেই সংগ্রহ থেকে তিলে তিলে তিলোত্তমা সৃষ্টি হবে। এভাবে একদিন এই বৃহত্তর গঙ্গাভূমির ইতিহাস সংকলিত হবে, ভারত ইতিহাসের সম্পূর্ণতাদানে সাহায্য করবে এবং তার কোন কোন উল্লেখযোগ্য অংশ বিশ্ব-ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ হিসাবে পরিগণিত হবে।

বিশ্বজনীন ভাবাদর্শে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই, অনুন্নত সম্প্রদায়ের গৌরবের কথায় উন্নাসিক মনোভাবের সংস্পর্শ থাকা উচিত নয়।

আবার, জাতিতত্ত্বে দেশতত্ত্ব নিরূপণের মত ভ্রমাত্মক পথও সর্বথা নিন্দনীয়। সেজন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক আলোচনা কেবলমাত্র ইতিহাসের সত্য অন্বেষণে যতটা বিশদ করার প্রয়োজন, ততটাই করতে হবে সচেতনভাবে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা চলে এসেছে বৈদিক যুগ থেকে; যার ফলে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে দীর্ঘকাল। ভবিষ্যতেও যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রকৃত ইতিহাস-অনুরাগীদের। বর্তমানে অবহেলিত কোন অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের গঠনমূলক ইতিহাস আলোচনায় যদি কোন গৌরবের কথা ওঠে, তাতে কেউ কেউ আঞ্চলিকতা-দোষ ও সাম্প্রদায়িকতার ভূত দেখেন। অসার যুক্তির বাঁধুনি দ্বারা প্রকৃত বিষয়কে গোপন করার কৌশলে বাস্তব ইতিহাস উদ্ধারের কাজ সাময়িকভাবে বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্য একদিন উদ্ঘাটিত হবেই। অন্যায় অসাম্য দূরীভূত হয়ে বর্ণবিদ্বেষহীন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। সমানুভূতি আসে গুরুত্ববোধ থেকে, দয়া-দাক্ষিণ্য থেকে নয়। গঙ্গারিডির ইতিহাসে যদি আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটের উপাদান মেলে এবং তার মূলে যদি দীর্ঘকালের নিপীড়িত শ্রমজীবী সম্প্রদায়গুলির অবদান থেকেই থাকে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। তাতে রক্ষণশীল সুবিধাভোগীদের আশঙ্কা অহেতুক। মহাবীর, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের জাতিবৈষম্য দূরীকরণের আদর্শ নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের জীবনযাপনে সহায় হলেও, ভিক্ষুক থেকে রাজাধিরাজ পর্যন্ত সেই আদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় দেশে দেশে শ্রমজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আজও বুদ্ধিজীবী ও পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব করার কোন অসুবিধা ঘটছে না। কোনরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, যার যা প্রাপ্য তা সহজে না পেলে বঞ্চিতেরা একদিন মরিয়া হয়ে উঠবে। মানবতার কণ্ঠরোধ চিরকাল করা যাবে না।

গ্রীক ঐতিহাসিকগণ প্রথমে গঙ্গামোহনা অঞ্চলে নিম্নবঙ্গের একটি সম্মিলিত জাতিগোষ্ঠীর নাম হিসাবে 'গঙ্গারিদই' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সেই নামটি নিঃসন্দেহে উপসাগরকূলবর্তী কয়েকটি প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নাম। ব্রাহ্মণ্যক্রিয়াকলাপ বর্জিত বলে সেই জনগোষ্ঠীগুলি মহাভারতীয় যুগে 'ম্লেচ্ছ' হিসাবে অবজ্ঞার পাত্র ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে; কিন্তু সেই সব সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব'লে প্রাসী ও কলিঙ্গসহ সমগ্র বৃহদ্বঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বিদেশী লেখকগণ কর্তৃক 'গঙ্গারিডি যুক্তসাম্রাজ্য' রূপে অভিহিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কোন

কোন গবেষক গ্রীকবর্ণিত সেই গঙ্গারিড়ি নামক প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীকে অস্বীকার ক'রে প্রাচ্য (প্রাসী) দেশসহ তাদের যুক্তসাম্রাজ্যকেই গঙ্গারিড়ি হিসাবে চিহ্নিত করতে চান, কিন্তু সেই মূল গঙ্গারিড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকৃত রাজ্যের অবস্থানক্ষেত্র দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধন ও বঙ্গ-জনপদের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ সমগ্র গাঙ্গোপদ্বীপ জুড়ে ব্যাপৃত ছিল, এটাই বাস্তব ঘটনা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই পুস্তকে বলেছি যে, টলেমি-বর্ণিত গঙ্গানদীর ম্যাগ্‌নাম্ (অর্থাৎ সরস্বতী বা বর্তমান হুগলী নদীর মোহনা) ও কাম্বিসাম্ (কংসাবতী মোহনা) থেকে বর্ধমান পর্যন্ত সম্ভবত প্লিনি কর্তৃক 'গাঙ্গেয়-কলিঙ্গ' হিসাবে বর্ণিত। কারণ, গঙ্গারিড়ির প্রাকৃতিক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত হলেও তাম্রলিপ্তসহ এই এলাকার কতকাংশ পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে জানা যায় এবং ভাষা ও প্রকৃতিতে কলিঙ্গীদের সঙ্গে এই অঞ্চলবাসীদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়, আর যেহেতু কলিঙ্গ ছিল প্রাসীর অধিকারে, সুতরাং এই অঞ্চলটিও একদা প্রাসীর অধিকারভুক্ত হয়েছিল বোঝা যায়। কিন্তু টলেমির বর্ণনায় এই অঞ্চলের একাংশ মূল গঙ্গারিড়ির অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে, তাও অসঙ্গত নয়। কারণ, এই এলাকা দীর্ঘকাল যাবৎ বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। গঙ্গারিড়ি, কলিঙ্গ ও প্রাসীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত এই এলাকা মেগাস্থিনিসের সময়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল বোঝা যায়, যার রাজধানী ছিল পর্তেলিস অর্থাৎ পূর্বস্থলী অথবা বর্ধমান। সে হিসাবে গাঙ্গেয়-কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাঢ় অঞ্চল।

বিদেশী লেখকরা মূল 'গঙ্গারিড়ি' জাতিগোষ্ঠী হিসাবে যাদের কথা লিখে গেছেন, জৈন আমলে তারা এদেশে 'পুণ্ড্রবর্ধনীয়' নামে অভিহিত ছিল এবং 'গঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গী' অর্থাৎ রাঢ়ীরা ছিল খব্বড়ীয় (কর্বটীয়) নামে পরিগণিত। অতি প্রাচীনকালে উত্তরবঙ্গে যে পুণ্ড্রদেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, একদা তা 'পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য' হিসাবে দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। উত্তরকালে 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি' হিসাবে আমরা তার অস্তিত্ব অবগত হয়েছি। সুতরাং এই 'পুণ্ড্রবর্ধন' রাজ্য-নামটি অর্বাচীন নয়; জৈনধর্মের প্রাধান্যকালে এই রাজ্যের অধিবাসীগণকেই 'পুণ্ড্রবর্ধনীয়' বলা হত। 'পুণ্ড্রবর্ধনীয় জৈন সাধুরা' ছিলেন তাঁদের চারটি প্রধান শাখার অন্যতম। জৈনদের চারটি প্রধান শাখাই বাঙালী মহাজাতিকে অবলম্বন করে গঠিত হয়েছিল। আর বৃহত্তর গঙ্গারিড়ি সভ্যতা বা সংস্কৃতিতে জৈনসংস্কৃতির অবদানকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। সুন্দরবন-সংস্কৃতির গবেষক গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তথ্যসহ লিখেছেন যে, সুন্দরবন

পর্যন্ত প্রাচীন জৈনসংস্কৃতি প্রসারিত হয়েছিল এবং একদা তারা ছিল কৃষি, নৌবিদ্যা ও বহির্বাণিজ্যে বিশেষ পটু ('গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকা', ফেব্রুয়ারী-১৯৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। বিশিষ্ট কথাশিল্পী সরোজকুমার দত্ত মহাশয় লিখেছেন যে, যে-সময় থেকে ইতিহাসের পটভূমিকায় আমরা তাদের প্রথম দেখতে পাই তখন কিন্তু তাদের মধ্যে জৈনধর্মের প্রসার লাভ হয়ে গেছে এবং পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্মও তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। সমসাময়িক জৈন ও বৌদ্ধবিহারগুলিই তার প্রমাণ। সেই কালসীমা আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের আগেই। সামরিক তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে একটা সুষ্ঠু ও সভ্য সমাজব্যবস্থাও তারা গড়ে তুলেছিল, গড়ে তুলেছিল উন্নততর অভ্যাসসমূহ। টোটেম পূজার সঙ্গে বা পাশাপাশি জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অনুসরণও তারা যে করত এ কথা সহজেই অনুমেয়। এ কথাও আমরা জেনেছি যে গঙ্গারিডি ও মগধের তৎকালীন রাজন্যবর্গও জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন ('গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকা', ফেব্রুয়ারী-১৯৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। সুন্দরবনের মাটির তলায় একই বসতিস্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে জৈনমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি, হস্তী, অশ্ব, বৃষ, মেষ, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি টোটেম পূজার নিদর্শন এবং কিছু মুণ্ডমূর্তি (বারা) যার গঠনশৈলীতে জৈন প্রভাব বা বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এগুলি থেকে দত্ত ও ঘোষ মহাশয়ের অভিমতের যথার্থতা প্রমাণিত হতে পারে।

শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ অতুল সুর মহাশয় ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'বঙ্‌গ্রীদ' শব্দটির সহিত 'গঙ্গারিদ্'শব্দটির সাদৃশ্য বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছেন। তিনি তাঁর 'History and Culture of Bengal' গ্রন্থেও এই শব্দটির উল্লেখ করেছেন। "যা নেই বেদে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে"—এই প্রবাদের বিপক্ষে আমি কিছু বলতে চাই না। বেদে পুণ্ড্র, বঙ্গ, বগধ প্রভৃতি যে সব প্রাচীন কৌম জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে, উত্তরকালে বিদেশী লেখকগণ সমষ্টিগতভাবে তাদেরকেই বৃহত্তর গঙ্গারিড়ি জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তফাৎ শুধু এই যে, বৈদিক আর্যরা তাদের সম্মানের চোখে দেখত না। বেদে পুণ্ড্র জনগোষ্ঠীকে 'দস্যুজীবী' বলা হয়েছে এবং বঙ্গ, বগধ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে 'পক্ষীজাতি' বলা হয়েছে, আর বিদেশী লেখকগণের রচনায় তারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান জাতি।

রামায়ণীযুগে এই বঙ্গভূমিতে পুণ্ড্রগণের অবস্থানের কথা আমরা অবগত হয়েছি। গঙ্গারিডিদের স্বাধীন রাজ্য প্রধানত দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধন ও তার সন্নিহিত এলাকায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময়ে এ অঞ্চলে জৈন সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং তাদের 'পুণ্ড্রবর্ধনীয়' শাখান্তর্গত ছিল

এই 'গঙ্গারিডি' জাতি। এ অঞ্চলের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, হৈহয়ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, ডোম প্রভৃতি বহু সংখ্যক যোদ্ধ, জনগোষ্ঠী দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী হিসাবে এদেশে পুণ্ড্রবর্ধনীয় বা পৌণ্ড্র জাতি (Nation) রূপে পরিগণিত ছিল, বর্তমানে যেমন 'বাঙালীজাতি'। আর ভাগীরথী-আদিগঙ্গার মোহনা অঞ্চলে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর লোকেরা সেখানে যে জনপদ গড়ে তুলেছিল, গ্রীক ও চৈনিক লেখকগণ তাকেই 'গঙ্গা' জনপদরূপে বর্ণনা করেছেন। একদা গঙ্গার মুখের সমস্ত বদ্বীপগুলি অর্থাৎ সমগ্র গাঙ্গোপদ্বীপ সেই দুর্ধর্ষ গাঙ্গেয় জনগোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত হয়েছিল এবং বিদেশীদের নিকট গঙ্গারিডি রাজ্য (State) নামে অভিহিত হয়েছিল। তারপর কলিঙ্গ ও মগধ (প্রাসী) সহযোগে সম্রাট ধননন্দের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল 'গঙ্গারিডি-কন্‌ফেডারেশন' বা যুক্তসাম্রাজ্য। সুতরাং বৃহত্তর গঙ্গাভূমি ও গঙ্গারিডি জাতি বলতে সমগ্র বৃহদ্বঙ্গ ও তার প্রাচীন অধিবাসীদের বোঝায়। তাহলে বর্তমানে যারা কৃষিজীবী-শ্রমজীবী ও অনুন্নত সম্প্রদায় হিসাবে উপেক্ষিত, তারাই একদা ছিল শৌর্য সম্পদে সমুন্নত স্বাধীন উপবঙ্গ রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা।

গঙ্গা-ভাগীরথীর মোহনা অঞ্চলে অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদের বিলুপ্ত সভ্যতার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হচ্ছে। আবিষ্কৃত হচ্ছে বিশাল গঙ্গা-অববাহিকা অঞ্চলের উন্নত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। নলরাজার গড় ও পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে আবিস্কৃত হয়েছে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর সমকালীন সভ্যতার নিদর্শন। বৃহত্তর গঙ্গাভূমি বিবিধের মাঝে মহামিলনের পুণ্যভূমি, আবহমানকাল সে ঐতিহ্য বজায় আছে। বর্ণ বৈষম্যবাদী ধর্মধ্বজী বৈদিক আর্যদের দুর্বার গতি প্রতিহত হয়েছিল এখানে ; কিন্তু জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ এ অঞ্চলেই অনুসৃত হয়েছে সর্বাধিক। বর্তমানে এই পৌণ্ড্রবঙ্গে তারাই আবার বিপুল সংখ্যায় ইসলামের সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কোথাও কোথাও আছে কিছু উপজাতি, কিছু বৌদ্ধ ও কিছু খ্রীষ্টান। আর বাদবাকী সকলে হিন্দুধর্মাবলম্বী বিচিত্র বর্ণের নানা সম্প্রদায়। আমরা সকলেই সেই গঙ্গারিডিদের বংশধর, সেই শৌর্যসম্পদশালী গঙ্গারিডিদের উন্নত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। গঙ্গারিডি সভ্যতার সময় থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বৃহত্তর গঙ্গাভূমির ইতিহাসই বাঙালী মহাজাতির উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। সেই বাস্তব ইতিহাসের আলোয় যখন উদ্ভাসিত হবে বৃহত্তর গঙ্গাভূমির বাঙালী-মহাজাতি, তখন সারাবিশ্বের দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ হবে এই সাগরসঙ্গতা পুণ্যতোয়া গঙ্গার বিস্তীর্ণ অববাহিকায়।

নির্ঘণ্ট

[গ্রন্থ, গ্রন্থকার, পত্রিকা, সংগ্রহশালা প্রভৃতিসহ]

গ্রন্থপঞ্জী

ডঃ অতুল সুর--বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন।
বাঙলার সামাজিক ইতিহাস।
বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।
হিস্ট্রি এ্যাণ্ড কালচার অব বেঙ্গল।
এফ. জে. মোনাহান—দি আর্লি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (ফার্ষ্ট ইণ্ডিয়ান রিপ্রিণ্ট—১৯৭৪)।
জে. ডবলিউ. ম্যাক্রিণ্ডল—এ্যানসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাজ ডেস্ক্রাইবড বাই মেগাস্থিনিস এ্যাণ্ড আরিয়ান (২য় সংস্করণ)।
ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার—শিলালেখ : তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ।
সিলেক্ট ইন্সক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি এ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ)।
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ (বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী)।
বিনয় ঘোষ— পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।
মহেন্দ্রনাথ করণ--পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ।
রজনীকান্ত গুহ—মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ (পুনর্মুদ্রণ : বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত)।

রমাপ্রসাদ চন্দ—গৌড়রাজমালা।
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—হিসট্রি অব বেঙ্গল।
বাঙলাদেশের ইতিহাস।
শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ—গৌড়কাহিনী।
সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ)।
ডঃ সুকুমার সেন—বঙ্গভূমিকা
ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী—হিস্‌ট্রি অব বেঙ্গল ১, ঢাকা ইউনিভার্সিটি।

[এই পুস্তকে উল্লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ, গ্রন্থকার, লেখক ও পত্র-পত্রিকার তালিকার জন্য 'নির্ঘণ্ট' দেখুন।]

কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

তাম্র প্রস্তর যুগ (?)— অর্থাৎ	রামায়ণে (অরণ্যকাণ্ড, ৪০ সর্গ) উল্লিখিত মগধ, পুণ্ড্র, অঙ্গ প্রভৃতি জাতির গঙ্গা-অববাহিকায় উপনিবেশ স্থাপন।
তাম্রাশ্ম যুগ (?)—	মহাভারতে উল্লিখিত বালেয-পুণ্ড্র, বাসুদেব-পুণ্ড্র, বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও সুহ্মরাজ প্রমুখের রাজত্ব। ভীমসেনের নিকট সাগর-কূলে জলপ্রধান লৌহিত্যদেশের বশ্যতাস্বীকার ও প্রচুর উপঢৌকন প্রদান।
বৈদিক যুগ—	পুণ্ড্র ও বঙ্গ জাতির সহিত বৈদিক আর্যগণের পরিচয়।
প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগ—	বঙ্গভূমিতে শিবিধর্ম, আজীবিকধর্ম ও জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা।
খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতক—	শিবিধর্ম শিক্ষার জন্য শুশুনিয়া (বঙ্কগিরি) পাহাড়ে গৌতম বুদ্ধের অবস্থান।
খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক—	মগধরাজ ঔগ্রসেন বা ধননন্দ কর্তৃক গঙ্গারিডি কন্‌ফেডারেশন গঠন। গঙ্গারিডি-প্রাসী যুক্ত-সাম্রাজ্যের অশেষ পরাক্রমের সংবাদ সম্পর্কে মিত্র পুরুরাজের স্বীকৃতি শুনে, দিগ্বিজয়ী আলেক-জাণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাগমন। তৎপূর্বে পানিনি-ব্যাকরণে প্রাচ্য, প্রাচ্যপুর, মগধ, কলিঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখ।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতক—মগধসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের রাজত্বকাল। মেগাস্থিনিসের ভারতে আগমন ও বিবরণগ্রন্থ রচনা, তখন পর্যন্ত কোন বিদেশী শক্তি গঙ্গারিডিদের পরাস্ত করতে পারেনি। এদেশে তখন দুর্ভিক্ষ ছিলনা।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতক— মহারাজ অশোকের রাজত্বকাল, কলিঙ্গ জয়। পুণ্ড্র-বর্ধনে তখন সমবায় প্রথা ও জনসংঘতন্ত্র। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার (মহাস্থান শিলালিপির বর্ণনামতে)।

খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক— দার্শনিক ঋষি পতঞ্জলির গ্রন্থে উন্মত্তগঙ্গ, লোহিতগঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল এবং গঙ্গার তৃণভূমির (ঘোষ) উল্লেখ।

খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতক— ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের বর্ণনায, গঙ্গার অব-বাহিকায গঙ্গারিড়িরা শ্রেষ্ঠ জাতি। রোমান মহাকবি ভার্জিল তাঁর 'জর্জিকাস্' মহাকাব্যে লিখেছেন যে, গঙ্গারিডিদের পরাক্রমের কথা সিংহ-দরজায় গজদন্ত ও সুবর্ণাক্ষরে লিখে রাখবেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ১ম-খ্রীষ্টীয় ১ম শতক—এশিয়ামাইনরের সুবিখ্যাত ভৌগোলিক স্ট্রাবোর গ্রন্থে প্রাসী ও গঙ্গারিডির উল্লেখ। ভারতীয ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ধর্মপত্নীদেরও দর্শন শিক্ষা দেন না, কারণ, তারা তা ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণকে প্রকাশ করতে পারে, নতুবা অর্জিত জ্ঞানের প্রভাবে পুরুষের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারে।

খ্রীষ্টীয় ১ম শতক—বাণিজ্য উপলক্ষে মিশর থেকে পেরিপ্লাস-গ্রন্থকার গ্রীক-নাবিকের গঙ্গাবন্দরে অবতরণ। এখানে তখন স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন ছিল। এখান থেকে তিনি বহু মূল্যবান দ্রব্য রপ্তানি প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অঞ্চলে তিনি গঙ্গা নামক জনপদ বা রাজ্যের অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেছেন। পেরিপ্লাস-গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন ম্যাক্রিণ্ডল (১৮৭৯) এবং স্ক (১৯১২), আর বাংলা অনুবাদ করেন যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (১৯২২) এবং; কমল চৌধুরী (১৯৮০)। রোমান কবি ভ্যালেরিয়াস ফ্লাকাস তাঁর 'আর্গো-

নটিকা' কাব্যগ্রন্থে প্রাচীনকালে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে গঙ্গারিডিদের সৈন্য সমাবেশের কাহিনীর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। কর্টিয়াস রুফাস, প্লিনি, প্লুটার্ক প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ গঙ্গারিডি ও প্রাসী সম্পর্কে নিজ নিজ গ্রন্থসমূহে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। ছিএন্ হন্ স্ন [illegible] চৈনিক গ্রন্থে চীনের সঙ্গে গঙ্গারাজ্যের বাণিজ্য-যোগাযোগের উল্লেখ।

খ্রীঃ ২য় শতক— আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি তাঁর 'ভূগোল বিবরণে' উল্লেখ করেন যে, সে সময়ে গঙ্গার মুখের সমস্ত এলাকা অর্থাৎ সমগ্র গাঙ্গেয় দ্বীপ গঙ্গারিডিদের দ্বারা অধিকৃত। তিনি [illegible] গঙ্গারিডি [illegible] রাজধানী গঙ্গানগরের সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন। এ ছাড়া, গ্রীক [illegible] গঙ্গানদী ও পাটলিপুত্র [illegible] বিশদ আলোচনা করেছেন।

খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক— ভৌগোলিক সলিনাস মেগাস্থিনিসের প্রসঙ্গ উল্লেখ কর[illegible], গঙ্গানদীর শেষ প্রান্তে গঙ্গারিডিদের রাজ্য, তিনি তাদের সৈন্যসংখ্যা এবং প্রাসী দেশ ও পাটলিপুত্র নগরের সবিশেষ বর্ণনা করেছেন।

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

বিশেষ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হল। শুভানুধ্যায়ী-গণকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। গঙ্গারিডি গবেষণা-কেন্দ্র মাসিক পত্রিকার সম্মানীয়-সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক (১৯৮৮) হিসাবে যাঁদের অর্থানুকূল্য ও সহযোগিতা পেয়েছি—

কলিকাতা : ডঃ অতুল সুর (প্রধান উপদেষ্টা), অক্ষয়কুমার বসু মজুমদার, অচিন্ত্য নস্কর, অমরনাথ ঘোষ, অশোককুমার রায়, এ এস এস শক্তি (শক্তি সরকার), গণেশচন্দ্র ঘোষ, গোলোকেন্দু ঘোষ, শ্রীজয়ন্ত, জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ডঃ জ্ঞানরঞ্জন হালদার, তারকনাথ নস্কর

ডঃ তারাপদ লাহিড়ী, দিগম্বর সাহিত্যরত্ন সাহিত্যবিশারদ, প্রণবকুমার বসু, ডঃ প্রভাতকুমার ঘোষ, বসন্ত মণ্ডল, কবি বসন্ত মণ্ডল, বিজন মণ্ডল, বিমল দত্ত, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, ডাঃ বিশ্বনাথ মণ্ডল, মন্মথনাথ নস্কর, মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, মিহিরলাল গায়েন, মৃণাল রায়, যোগমায়া দাস, সরোজকুমার দত্ত, সাধনকুমার মণ্ডল, সাধন হালদার।

দার্জিলিং ঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস **জলপাইগুড়ি ঃ** ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

পশ্চিম-দিনাজপুর ঃ রাজেন্দ্রনাথ দাস। **পুরুলিয়া ঃ** প্রমোদবরণ বিশ্বাস

মালদহ ঃ শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী। **নদীয়া ঃ** উত্তম হালদার, জবা রাহা।

হাওড়া ঃ অচল ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রনাথ পর্বত, রামদাস ঘোষ, মধুসূদন দোলই।

হুগলী ঃ দেশপ্রিয় বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দে।

মুর্শিদাবাদ ঃ অশোককুমার রায়, কিশোরীমোহন সরকার, তাপসকুমার দাস, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, ননীগোপাল দাস, নবীনচন্দ্র দাস, বিজনকুমার রায়, ডাঃ রাধানাথ সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ সরকার, সনৎকুমার সিংহ, সন্তোষকুমার দাস, সমরনাথ ব্যানার্জী, সুশীলকুমার সিংহ।

মেদিনীপুর ঃ অরবিন্দকুমার মাইতি, কল্যাণীপ্রসাদ দাস, কোহিনুরকান্তি করণ, গীতশ্রী করণ, চণ্ডীচরণ পাত্র, দীপকরঞ্জন মিত্র, ডঃ প্রবালকান্তি হাজরা, মানসরঞ্জন মণ্ডল, রণজিৎকুমার দাস, শ্যামাপদ সাহু, সাধনা দাস।

উত্তর-চব্বিশপরগণা ঃ আশীষ ভট্টাচার্য, গোবর্ধন নস্কর, গোলাম হোসেন গোষ্ঠবিহারী দে, এম. এ. জব্বার, দিলীপ মৈতে, নকুল মল্লিক, নরেন্দ্রকুমার নাথ, নারায়ণচন্দ্র নস্কর, বিধানচন্দ্র হালদার, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র নস্কর, সন্তোষকুমার জোদ্দার, হেমজ্যোতি হালদার।

দক্ষিণ-চব্বিশপরগণা ঃ অক্ষয়কুমার কয়াল, অতুলকুমার মণ্ডল, অধরচন্দ্র দাস, অধীরচন্দ্র মণ্ডল, অধীরচন্দ্র মণ্ডল (২), অনন্তকুমার নস্কর, অনিল খাঁড়া, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য, অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অময়কৃষ্ণ সরদার, ইন্দ্রকুমার হালদার, ইন্দ্রজিৎ দত্তমজুমদার, উদয়শঙ্কর হালদার, ওয়াজেদ আলি, কাঙ্গালচন্দ্র রায়, কালীপদ মণি, কিশোরীমোহন নস্কর, কৃত্তিবাস দাস, ক্ষিতিরঞ্জন গায়েন, গায়ত্রী যতি, গোবিন্দপ্রসাদ হালদার, গোষ্ঠবিহারী দাস, গৌতম হালদার, গৌরহরি পাল, চারুচন্দ্র গায়েন, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, জগন্নাথ জানা, জগন্নাথ মাইতি,

জয়কৃষ্ণ কয়াল, জয়নারায়ণ দাস, তনিমা মিস্ত্রী, তারাপদ হালদার, তারিণীচরণ হালদার, ত্রিদিব হালদার, দাশরথি সরদার, দিবাকর পণ্ডিত, দুর্গাচরণ মণ্ডল, দেবপ্রসাদ হালদার, ধনঞ্জয় নস্কর, ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ধীরেন্দ্রনাথ সরদার, ধূর্জটি নস্কর, নমিতা হালদার, নলিনীকান্ত হালদার, নিমাইচাঁদ হালদার, নিয়তিকুমার মাজি, ডাঃ নিশিকান্ত নস্কর, ডাঃ পঙ্কজ পুরকাইত, ডাঃ পশুপতি নস্কর, পাঁচুগোপাল রায় কবিরত্ন, প্রতিভা সরদার, প্রতুলকুমার রায়, ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী, প্রেমানন্দ প্রামাণিক, বঙ্কিমচন্দ্র মণ্ডল, বটকৃষ্ণ হালদার, বিনোদবিহারী দাস, বিভুপ্রসাদ বসু, ডাঃ বিমল নস্কর, বিমলেন্দু হালদার, বিষ্ণুপদ নস্কর, ভূতনাথ মণি, ভূধরচন্দ্র হালদার, ভোলানাথ হালদার, ডঃ মণীন্দ্রনাথ জানা, মদনমোহন নস্কর, মধুসূদন পুরকাইত, মনোরঞ্জন রায়, মানিকচাঁদ পাইন, মিহিরকান্তি নায়বান, মিহির ঘরামি, মুরারী দেবনাথ, যতীন্দ্রনাথ সিংহ, রণজিৎ সিকদার, রবিশঙ্কর দাস, রবীন্দ্রনাথ পাইন, রসময় পণ্ডিত, রাধাকৃষ্ণ নস্কর, রামচন্দ্র ধাড়া, লক্ষ্মণচন্দ্র মণ্ডল শঙ্করপ্রসাদ নস্কর শুভঙ্কর মণ্ডল, শেফালী মাইতি, সঞ্জয়কুমার তাঁতী, সত্যেন্দ্রনাথ বেরা, সনৎকুমার নস্কর, সন্তোষকুমার রমণ, সন্তোষকুমার মণ্ডল, সবুজবরণ হালদার, সরস্বতী পুরকাইত, সলিল দেবশর্মা, সুকুমার ঘোষ, সুকুমার মিস্ত্রী, সুকুর আলি তরফদার, সুখেন্দু সেনগুপ্ত, সুজয় ধাড়া, সুতপা পাত্র, সুদর্শনচন্দ্র পাইন, সুদর্শন বৈরাগী, সুধাংশু কয়াল, সুধাংশুশেখর মাইতি, সুধীরচন্দ্র বেতাল, সুধীরচন্দ্র হালদার, সুনীলকুমার সরকার, সুনীলরতন বিশ্বাস, সুবিমল ভঞ্জা, সুভাষচন্দ্র পুরকাইত, সুশীল মিস্ত্রী, হরিচরণ নস্কর, হরিপদ বাগুলি, হীরালাল হালদার।

বিহার: সিদ্ধার্থ ঘোষ রায়। **বাংলাদেশ:** বিভুতোষ রায়।

সহযোগী পত্রিকাপঞ্জী

অগ্নিশিখা, অতসী, অমৃতলোক, অর্পণ, অহল্যা।

আগন্তুক, আগুন, আপনজন, আলবুশরা, আলেয়া, আসানসোল পরিক্রমা

ইস্পাত। একলব্য।

কথালোক, কবিতাপত্র, কল্যাণী, কিচিমিচি, কুলিশ, কুসুমের ফেরা।

খেজুরী। **গঙ্গাহৃদি**, গণকণ্ঠ, গাঙ্গেয়, গ্রামনগর, গ্রেটবেঙ্গল।

চমক, চল যাই, চেতুয়া সমাচার। **ছাড়পত্র।**

জনতীর্থ, জাজঙ্গল, জীবন থেকে নেয়া। **ঝাড়গ্রাম** হিতৈষী।

ডানপিটেদের আসর, ডানপিটেদের সমাচার। **তরঙ্গ**, ত্রিপুরা সমাচার।

দক্ষ নাবিক, দক্ষিণবারাশত সাহিত্যপত্র, দখিনা, দর্পণ, দিশারী, দেশ আমার মাটি আমার, দেশকাল। **ধ্বনি**প্রবন্ধ।

নতুন মুখ, নবদিগন্ত, নববঙ্গ, নারী শিল্পাঙ্গ, নবারুণ, নহুচাঁদ, নৈরঞ্জনা।

পথসংকেত, পর্ণী, পর্যালোচনা, পাদপ্রদীপ, পুরাপল্লী, পৃথিবীর পাঠশালা, প্রকাশ প্রয়াস, প্রতিচ্ছায়া, প্রদীপ, প্রমথ, প্রাত্যহিকী, প্রান্তদেশ।

বঙ্গবার্তা, বর্ণালী, বন্দর, বসুধা, বহুজননায়ক, বাংলার কৃষিশিল্প।

ভিড়ের ছোঁয়া। **মন**বাণী, ময়ূখ, মিছিল, মুকনায়ক, মেঘলা অবকাশ।

যষ্টিমধু, যোগসূত্র। **রবীন্দ্র**সাহিত্য, রাজনসম্পর্ক বানার।

লবণাক্ত, লোকস্বরাজ। **শব্দমিনার** শিশুমালঞ্চ, শিল্প ও সাহিত্য, শুভদূত।

সংগ্রামী নন্দীগ্রাম, সংস্কৃতি, সবুজের অভিযান, সব্যসাচী, সংবাদ, সমাজদর্পন, সহযোগিতা, সাহিত্যমেলা, সিগন্যাল, সিন্ধুকা, সীমান্ত, সীমায়ণ, সুন্দরবন, সুন্দরবন অর্ঘ্য, সুন্দরবন জাগরী, সুন্দরবন সমাচার সূর্যিমামা, সূর্যদেশ। **হলুদ** পাখি, হোত্রী।

"ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদে গড়ে তুলতে হবে আজিকার ভারতের জীবনবেদ। আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে আধুনিককালে এবং আধুনিক পরিবেশে। কিন্তু আমি তাদের দলভুক্ত নই—যারা আধুনিকতার উৎসাহে অতীতের গৌরবকে ভুলে যায়। অতীতের বুনিয়াদে আমাদের দাঁড়াতে হবে। ভারতের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যাকে ভারতের নিজস্ব ধারায় বিকাশোন্মুখ করে তুলতে হবে। এক কথায় আমাদের একটি সমন্বয়ে আসতে হবে। একদিকে আমাদের বেদের যুগে ফিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হবে, অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপের অর্থহীন বিলাস ও পরিবর্তনের লালসার প্রতিরোধ করতে হবে।"

—সুভাষচন্দ্র বসু